বাবার কথা

উমা দেবী

মিত্রালয়
১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

॥ তিন টাকা ॥

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
মানসী প্রেস ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলি-৬ হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্মউপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্মউপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাজ থেকে শিক্ষা-দান গ্রহণ করেছে। বাংলা দেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মঅবমাননা স্বীকার করে নেয় তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলা দেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি ॥....

॥ শান্তিনিকেতন, ১৩ই জুলাই ১৯৪১ ॥

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

'বাবার কথা'র লেখিকা অবনীন্দ্রনাথের কন্যা উমারাণী দেবী সাহিত্যযশ-ভরসায় এই স্মৃতি-কথা লিখতে বসেন নি, একথা তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন। বইখানি রচনা এবং প্রকাশনা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অবনীন্দ্রনাথের শেষতম শিষ্য অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের কাছে খবর পেলাম যে, উমা দেবী তাঁর বাবার সম্পর্কে কিছু লিখছেন। তারপর ৺ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মেনকা দেবীর সাহায্যে একদা 'বাবার কথা' প্রকাশের সুযোগ এসে গেল। নানা কারণে বইখানি প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে, ক্রটী স্বীকার করলেও এ বিলম্বের খেসারৎ দেওয়া সম্ভব নয়—অকস্মাৎ ক্ষেমেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করেছেন।

বইখানির কলেবর ছোট হলেও এতে এমন অনেক স্মরণীয় তথ্য আছে যা অমূল্য। অবনীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতি এবং তরুণের স্বপ্ন এই গ্রন্থে মুদ্রণের জন্য ছবির ব্লক দিয়ে সাহায্য করেছেন সেজন্য তাঁদের কাছে 'মিত্রালয়' ঋণী। প্রচ্ছদপটের ছবি এঁকেছেন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করেছেন শ্রীযুক্ত শুভ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস।

শেখ
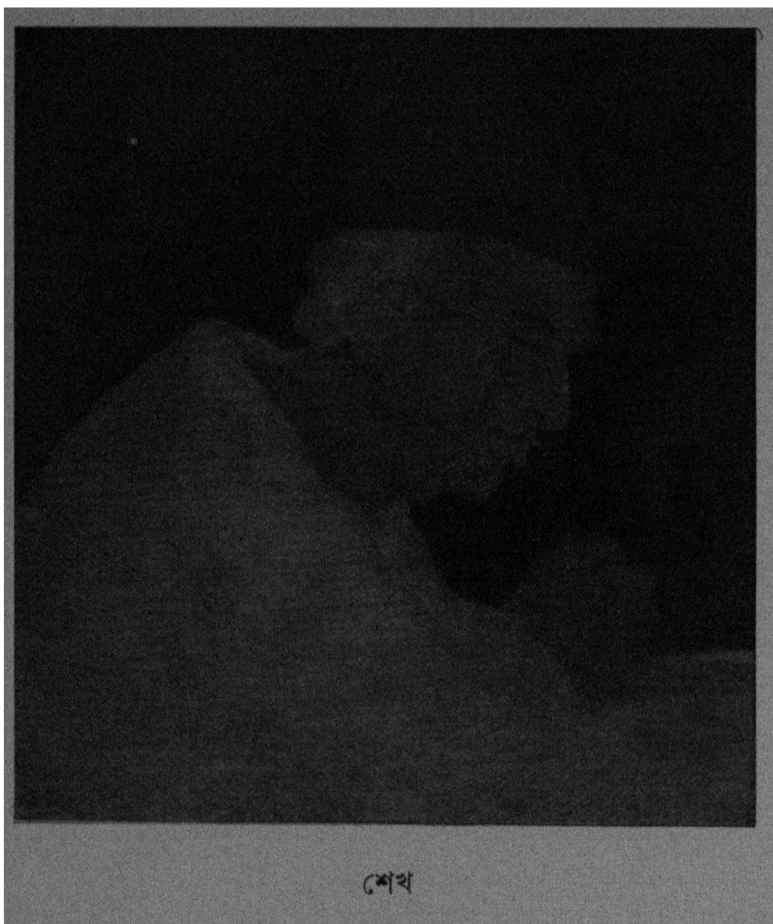
এতকাল পরে আজ যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় সে যুগটা যেন অনেক তাজা, অনেক বেশি জীবন্ত। সেই সেকালের যে 'আমি'কে দেখতে পাই তার মন যেন এই শেষ বয়সের 'আমি'র চেয়ে অনেক সত্য। অথচ, সত্যি কথা স্বীকার করতে গেলে আমাকে মানতেই হয় যে, চলেই এসেছি এতকাল। তখন ত মনেও হয়নি যে ফেলে যাওয়া দিনগুলোর জন্যে কখনো কোনো মমতা হবে। থামিনি, ভাবিনি, শুধু চলেছি। এতদিন কেবল এগিয়েই এসেছি। ভাগ্যের দান দু-হাতে কুড়িয়ে নিয়েছি—হিসেব রাখিনি কিছুরই। আজ যখন হাতে অখণ্ড অবসর মিলে গেল, মনে ক্লান্তির অবসন্নতা হাই তুলছে, তখন কি জানি কেন চোখ বুজলে ছবি দেখতে পাই। ছবির মিছিল এ ছবির কোনো ইতিহাস জ্ঞান নেই। কখনো খুব কাছের দিনের পাশেই অনেক দূরের দিন এসে ব'সে পড়েছে। কোথাও বা বিরাটের পাশে খুব ছোট্ট তুচ্ছ ঘটনা টুক ক'রে নিজের ঠাঁই ক'রে নিয়েছে অবাক হয়ে যাই আমি।

তবে এসবের মধ্যে বাবার ছবিই খুব বেশি দেখতে পাই। তিনি যেন সবকিছুর মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে রেখে দিয়ে গেছেন। অথচ এই মনটা এমনই ঢিলে-ঢালা হয়ে গেছে যে, অনেক সময়ে তাঁর সঙ্গে, তাঁর আঁকা ছবিকেও মিশিয়ে ফেলে। মনের রহস্য যাঁরা জানেন আমি তাঁদের দলে নই, কোনো দিনই ছিলাম না। কাজেই এই মেলামিশির রহস্য বুঝি নে!

দিন এখনও কাটে, কিন্তু সেকালের মতো নয়। তাই ইচ্ছে করে সেই সেদিনে ফিরে যেতে পারলে বেশ হতো! তাহলে আমি আমার এই পরিণত মন আর চোখ নিয়ে সেই কালটুকু ভালোভাবে দেখেশুনে বুঝে নিতে পারতাম। ভাবি, আর হাসি পায়। তাও কী হয় নাকি! তা হয় না, তবে একটা বিকল্প উপায় খুঁজে পেয়েছি। একা বসে বসে যে সব ছবি দেখি সেগুলো বড় ভালো লাগে। এত ভালো লাগে যে, ইচ্ছে করে বার বার দেখতে। অনেকবার এমনও হয়েছে যে, একটা দিনের সমস্ত ঘটনা এক চমকে চোখের সামনে জেগে উঠল। আহা! চোখ বুজে বুজে সেই ছবি একটু একটু ক'রে খুঁটিয়ে দেখলাম। দেখতে দেখতে এমনই ডুবে গিয়েছি যে, নিজেকে তার মধ্যে মিশিয়ে ফেলে—হদ্দমুদ্দো বর্তমানটা বরবাদ ক'রে বসেছি। কিন্তু বর্তমান ত আর স্মৃতি নয় যে ভেসে উঠে অতলে হারিয়ে যাবে। সে ঠিক 'আমি আছি' ব'লে হুমকি দিয়ে হাজির হয়। হয়তো বা কোনো নাৎনীর ডাক নিয়ে হাজির হ'ল —'কি করছ, ঘুমুচ্ছো?' নাঃ আর হ'ল না ছবি দেখা। তারপর অনেক চেষ্টা ক'রেও ঠিক সেই আধখানা-দেখা ছবিটার আর দেখা পাই নে। সে পালিয়েছে। হরদম ওরা আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

ছবিগুলো ঘুরে ফিরে দেখার মতলব একটা মাথায় এসেছে। আচ্ছা, যদি এক কাজ করি—যদি লিখে রাখি! যেমন যেমন মনে পড়বে তেমনটিই লিখে রাখব। কি হয়? অন্ততঃ একটা সুবিধে হয় তাতে—লেখার রেল-লাইন দিয়ে সেই ছবিটার ইস্টিশানে পৌছতে পারবো। তারপর হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সাকিন্‌-মোকামটা খুঁজে বার করা যাবে। তবে একটা অসুবিধে আছে। হয়তো কলকাতার পাশেই পুরীর ছবি, তার পাশে মোরাবাদী কিম্বা মুঙ্গের, তার পাশে এসে যাচ্ছেন রবিদাদা কিম্বা এস্‌রাজ হাতে বাবা! তা হোক, আমার এ লেখাও ত আমারই জন্যে। এখানে

দায়িত্বের বালাই নেই, ইতিহাসের হুমকি শুনতে গেলে কলম থমকে থেমে যাবে। ব্যাকরণের শাসানীকেও ভয় করলে চলবে না। আমার বাবা ছবি 'লিখতেন', আমি লিখব পুরনো দেখা ছবির কথা! আমার এ লেখা থেকে যদি কেউ কোনো গুরুগম্ভীর ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন তবে তাঁকে নির্ঘাৎ ঠকতে হবে। স্পষ্ট করে বলে রাখা ভালো —এ আমার নিজের অশক্ত মনের স্মৃতিচারনা, এর মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই, এতে ইতিহাস নেই, নিতান্ত ঘরোয়া মেয়েরই পিছু ফিরে চাওয়া। এর মূল্য নেই আর কারুর কাছে, শুধু আমারই জন্যে আমার লেখা। তবে এ ছবি একেবারে জীবনের অনেক বছরের কাছ থেকে ফেরৎ চেয়ে নেওয়া। মিথ্যের অবকাশ একবিন্দুও নেই। আমি কল্পনার কাছে কুণ্ঠিত —সত্যের-সিং-দরজায় মাথা গলিয়ে চলার পুরানো সেকেলে অভ্যেস এখনো ছাড়তে পারিনি। এইটুকু ভরসা দিয়ে যদি কাউকে খুশি করতে পারি, তাহলে আমার খুশির সঙ্গে তাঁর খুশি একাকার হয়ে পড়বে। এতদিন কেবল এগিয়েই এসেছি। পিছনের দিকে চাইবার দরকার হয় নি, অবকাশও হয় নি। নিজের তাগিদেই আজ চ'লে-আসা পথের দিকে ফিরে চাইছি। দেখতে পাচ্ছি না তার আরম্ভ কোথায়! সুদূর দিগন্তে মিশে গেছে রেলের লাইনের মত। দৃষ্টি হ'য়ে এসেছে ঝাপ্‌সা, যতদূর চোখে পড়েছে, স্পষ্ট দেখা যায়না সবটা তার—কি ছিল পথের দুপাশে, কারা ছিল সঙ্গে কত দূর পর্যন্ত, মনে প'ড়েও যেন পড়ছে না। তবুও চেষ্টা করছি যতদূর দেখা যায়, ফেলে-আসা পথের, যতদূর মনে পড়ে নানা রঙের দিনগুলোর কথা লিখতে—কেবল নিজের তাগিদে।

বাবার কথা লিখতে বসেছি, বাবার জীবনী নয়। নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনী। এতে হয়তো থাকবে না ধারাবাহিকতা থাকবে না সম্পূর্ণতা। তা না থাকলেও তাঁর অন্তরের অন্দরমহলের স্নিগ্ধ ছবিগুলোরই কয়েকটা

টুক্‌রো এতে পাওয়া যাবে! যাঁরা তাঁর জীবন চরিত রচনা করবার চেষ্টা করবেন তাঁদের কাজে লাগলেও লাগতে পারে। তবে কারও অনুরোধে বা কারও দরকারে লাগবে বলে আমি কিছু লিখছি না। বাবার কথা লিখ্‌তে ভালো লাগ্‌ছে, ভাবতে ভালো লাগছে—তাই মনে ক'রে লেখবার চেষ্টা করছি।

আমি তখন খুব ছোট্ট। ভোর হ'লেই দেখতুম বাবা দোতালায় নেমে আসতেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর কথা বলছি। বাবা, মা, আমরা ভাই-বোন সকলে তখন তেতালায় থাকতুম। বাবা মুখ ধুয়ে বাগানে বেড়াতেন। দিনের সূচনায় বোধহয় তাঁর প্রথম কাজ ছিল ভোর-বেলাকার সৌন্দর্যকে মনের মধ্যে ধ'রে রাখা। গোলাকার বাগানে খানিক পায়চারি ক'রে লোহার বেঞ্চে বসতেন। আমিও খুব ভোরে উঠে গুপিদাসীর সঙ্গে যেতুম বাগানে। শিউলির সময় শিউলি, বকুলের সময় বকুল ফুল কুড়োতুম গাছের তলায়। বাবা তখন আমায় কাছে ডেকে নিয়ে আকাশের রং দেখাতেন, গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন—কোন গাছটির কি নাম, কার কখন ফুল হয়, কোন্‌ ফুল কেমন রংয়ের হয়, কার গন্ধ কেমন লাগে। নানা রকম গল্প হতো পিতা-পুত্রীতে। এখন মনে হচ্ছে, প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই তিনি এইভাবে প্রকৃতির অ-আ-ক-খ শেখাতেন।

তেতলার ঘরের জানালা খোলা হ'লে বাবা বলতেন, "যাও নেলী তোমার মা উঠেছেন, দুর্গা নাম লেখোগে।" মায়ের পূজোর কাছে বসে

আলতা দিয়ে শরের কলমে করে দুর্গা নাম লিখতে হতো এক পাতা রোজ। তখন বোধহয় আমার বয়স আট কি নয় বছর।

দুর্গা নাম লেখার পর আমাদের দুধ খাবার পালা। সে ডাক আসতো দিদিমার। বাবার মাকে আমরা দিদিমা বলতুম। দোতালার বারাণ্ডায় একটা তক্তায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতেন দিদিমা, তাঁর পাশে ছোটো পিসি। বল্লভ গোয়ালা দুধ আনতো, সোনার মত চক্‌চকে পিতলের তিন চারটে কেঁড়েতে করে। রূপোর মত ঝক্‌ঝকে একটা বড়ো কড়া, তাতে থাকতো ঐ রকম ঝক্‌ঝকে একটা ডাবু হাতা, তাতে করে দুধ মেপে নিয়ে জ্বাল দিয়ে আনতো শ্রীনাথ চাকর। ঢালা উপুড় করে ফেনা কাটিয়ে বাটিতে বাটিতে দুধ দিতো আমাদের। অবিনাশ নিয়ে আসতো বাবা ও জ্যাঠামশায়ের রূপোর বাটি আর পিরিচ। দিদিমা নিজের হাতে বাটি ভরে দিতেন ফেনা সমেত দুধ বাহিরে পাঠিয়ে। বাবা আর জ্যাঠামশাইরা তখন এসে বসেছেন দক্ষিণ দিককার বারাণ্ডায়। অবিনাশের পিছু পিছু আমিও হাজির হতুম সেখানে। বাবা খেতেন দুধের বাটিটা দুই হাতে অঞ্জলি করে ধরে। এই অভ্যাস ছিল বাবার বরাবর। ঘটিতে জল খেতেন অঞ্জলি করে ধরে। ইদানীং মোটেই দুধ খেতে চাইতেন না। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "বাবা, তুমি আগে অত দুধ খেতে, এখন কেন খাও না?" বাবা বললেন, "সে যে মায়ের হাতে করে দেওয়া দুধ, হজম হ'য়ে যেতো। এখন কি হজম হয় রে!" এমনি ছিল তাঁর মাতৃভক্তি।

বেলা আটটার সময় নবীন বাবুর্চি রুটি টোষ্ট, ডিম সেদ্ধ ট্রেতে করে এনে ধরে দিতো তিন বাবুর সামনে। আগে তাঁরা কাকেদের খাওয়াতেন, তারপর নিজেরা খেতেন। বিশ্বম্ভর বেয়ারা তামাক দিয়ে যেতো তিন বাবুকে।

এর পর কাজের পালা। বাবা বুঝি তখন ক্ষীরের পুতুল লিখছেন। তারপর শকুন্তলা, আরও কতো বই। বেশীরভাগ বইই ছোটো ছেলে-

মেয়েদের জন্যে। বইটি লেখা হ'লে প'ড়ে শোনাতেন আমাদের। বাবার মুখে গল্প শুনতে কী ভালোই লাগতো আমাদের। কী যে ভাব দিয়ে বলতেন তিনি! দুঃখের সময় কাঁদাতেন, হাসির সময় হাসাতেন। তাঁর বলার ভঙ্গীতে এমনি যাদু ছিল, আমরা শুনতে শুনতে তাঁর সেই গল্পের রাজ্যেই চ'লে যেতুম।

এর অনেক আগে থাকতেই বাবা ছবি আঁকছেন। যখনকার কথা বলছি, বাবা তখন বেশীরভাগ অয়েলপেন্টিং করতেন। একতলার বিলিয়ার্ড খেলবার ঘরে একটা মস্ত ইজেল, তার উপর কাঠের ফ্রেম ক্যাম্বিসে মোড়া; হরিশবাবু রং মেড়ে ঠিক করে দিচ্ছেন আর বাবা এঁকে চলেছেন। হয় লেখা, নয় আঁকা, এই দু'য়ের একটা চলতো প্রায় দুপুর পর্যন্ত।

বেলা বারোটা নাগাদ স্নান সেরে তিন ভায়ে খেতে বসতেন দিদিমার সামনে। খাওয়া শেষ হলে বাহিরে চলে যেতেন। পাথরে বাঁধানো ছোটো ঘরে তাঁরা শুতেন। গরম কালে বেহারা টানতো টানা-পাখা। পরে যখন সেটা ছেলেদের পড়বার ঘর হ'লো তখন তাঁরা শুতেন লাইব্রেরী ঘরে। বেলা তিনটের সময় নীলু চাকর ডাব এনে খাইয়ে যেতো তিন বাবুকে। চারটের সময় বাবা যেতেন তেতলায় দিদিমার হল ঘরে। দিদিমার কাছ থেকে পান খেয়ে একটু গল্প ক'রে আমার মায়ের ঘরে আসতেন। সেই সময় এস্‌রাজ বাজিয়ে গান শেখাতেন আমাকে। পাঁচটার সময় নিচের বারাণ্ডায় নেমে আসতেন। দিদিমাও তখন এসে বসতেন ছোটো পিসির বারাণ্ডায়। সাদা পাথরে করে নোনতা খাবার, ফল, মিষ্টি সাজিয়ে বড়মা পাঠিয়ে দিতেন অবিনাশ আর নীলুকে দিয়ে—ওঁদের বিকালের জল-খাবার। জলযোগের পর সকলে নেমে যেতেন বাগানে। সেখানে জড়ো হতো সব ছেলেমেয়ে আর জুটতেন এ-বাড়ী ও-বাড়ীর বাবুরা। সে এক সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি হতো তখন।

সন্ধ্যেবেলা গরমিকালে চাঁদনী রাতে ছাতে বসা হ'তো দিদিমার কাছে। গল্প হ'তো কত রকমের। কোনো কোনো দিন বা বড়বাড়ীর তেতালার ছাতে বসতো আসর। রবিদাদার গান আর বাবার এস্‌রাজ। সে-সময় আমাদের পড়তে হতো পিসেমশায়ের কাছে। সন্ধ্যেবেলায় আসরে যোগ দেবার লোভে দুপুরে আগে থাকতে আমরা পড়াশোনার কাজ সেরে নিতুম। সন্ধ্যেবেলা দিদিমার মহলে সকলকেই একবার বসতে হ'তো, তারপর যেতুম বাবার ঘরে। তাঁর কাছে গল্প শোনা ছিল আমাদের নিত্যকারের জরুরী কাজ। কত গল্পই যে বলতেন, কী সুন্দর ক'রে, কী সহজ ভাষায়! ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আমরা, বেশ বুঝতে পারতুম—রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, আরো কতো কী গল্প!

শীতের সময় সন্ধ্যেবেলা ভাইবোনেরা সবাই মিলে বালাপোশ মুড়ি দিয়ে জমিয়ে বসে গল্প শুনতুম শিমলের দিদির কাছে। বাবাও দিব্যি বালাপোশ মুড়ি দিয়ে বসে যেতেন আমাদের সেই গল্পশোনার আসরে। কতো গল্প বলে যেতেন তিনি অনর্গল—কঙ্কাবতীর কথা, দুয়োরাণী সুয়োরাণীর কথা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা, আরও সব কতো গল্প। এখন তার কিছুই মনে নেই আমাদের। বাবার কিন্তু সব মনে ছিল—আমাদের বলতেন। কী অদ্ভুত তাঁর স্মরণশক্তি!

রাত্রি ন'টার সময় ডাক আসতো 'ডিনারের'। ডিনার খাওয়া সেরে বাইরের ঘরে বসে তামাক খেতেন তাঁরা। তখনকার দিনে অন্দরে আদৌ তামাক খাওয়ার রেওয়াজ ছিলো না। তামাক খাওয়ার পর উপরে উঠে যেতেন যে যার শোবার ঘরে।

এই ছিল বাবার প্রতিদিনের কাজের তালিকা—বাঁধা রুটিন। তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ দিনগুলো কেটেছে এই নিয়মে। তার মাঝে একটু আধটু অদল-বদল যে হয়নি, তা নয়। সমুদ্রে বড় বড় জাহাজকেও

প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন আন্দোলিত করে, তেমনি সংসারের শোক-সন্তাপ এসে বাবার মনকে বিচলিত ক'রেছে প্রতিদিনের কর্মতালিকার ওলট-পালট হয়েছে। কিন্তু কয়দিনের মধ্যেই দেখতুম তিনি আবার তাঁর মনরূপ জাহাজকে লক্ষ্য-পথে ঠিক চালিয়ে নিয়ে চলেছেন।

আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, এখন যেখানে রবীন্দ্র-ভারতীর বাড়ী হ'য়েছে সেখানে ছিল একটা বিরাট তিনতলা বাড়ী। তারই একতলায় একটা বড় হল ছিল বিলিয়ার্ড খেলবার জন্যে। রবিদাদা প্রস্তাব করলেন সেই হল আর তার পাশের ছোট ছোট ঘরগুলো নিয়ে একটা স্কুল খোলা হোক, এবাড়ীর আর ওবাড়ীর ছেলেমেয়েরা সেই স্কুলে পড়বে। যেমনি প্রস্তাব তেমনি কাজ। স্কুল খোলা হ'লো। আমরা আর ওবাড়ীর ছেলেমেয়েরা পড়া শুরু ক'রলুম সেই স্কুলে।

সপ্তাহে একদিন ক'রে দোতালার লাইব্রেরী ঘরে সভা বসতো, বালীগঞ্জ থেকে মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আসতেন, রবিদাদা, বাবা, জ্যাঠামশাইরা এবং পিসেমশাইরা এই সভায় উপস্থিত থাকতেন। নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকও মাঝে মাঝে এই সভায় যোগ দিতেন। ছেলেমেয়েদের দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করানো হ'তো, গান করানো হ'তো এই সভায়। যার ভাল হ'তো তাকে পুরস্কার দেওয়া হ'তো শিশুদের উপযোগী জিনিষ। একবার আমি বাবার কাছ থেকে একটি কবিতা শিখে আবৃত্তি করেছিলুম, পুরস্কারও পেয়েছিলুম ভাল আবৃত্তি করার জন্যে। কবিতাটি এখনও মনে আছে, মনমোহন বসু মহাশয়ের লেখা—

সদাই ধায় নদীর ঢেউ,
রাখিতে তায় পারে না কেউ।

সময় যায় তাহারই প্রায়,
কাহারও মুখ চাহে না হায়।
চলেছে দিন চলেছে রাত,
ধরিতে তায় কাহার হাত!
ধরিতে তায় সে পারে ভাই,
আলস্য যার শরীরে নাই।"

বাবা আমাকে এই কবিতার মানেটি এমন সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আজও তা মনে আছে। আমার কর্মজীবনই বলো, আর ধর্মজীবনই বলো, এই কবিতাটি মনে পড়লে আমি প্রেরণা পাই—বাবার উপদেশ মনে পড়ে।

তিনি কত বছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন আমার মনে নাই। একদিন দেখলুম বিলেত থেকে একটা মস্ত বড়ো পার্শেল এলো। খুলে দেখা গেল তার ভিতরে র'য়েছে একটি বিবি পুতুল আর চমৎকার কতকগুলি ছবির বই আর একখানা চিঠি। বিলাত থেকে ডাচেস অফ্ সাদারল্যাণ্ডের মেয়ে পাঠিয়েছেন। চিঠিতে বাবাকে লিখেছেন—'তুমি বোধহয় জানো না, তোমার ছোটো দাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার বড় প্রিয় ছিলেন। শুনলুম, তুমি ছবি আঁকো। আমিও একজন আর্টিষ্ট। তোমার জন্যে কয়েকখানা ছবির বই পাঠালুম। তোমার মেয়ে হয়েছে শুনে তার জন্যে একটা 'ডল' পাঠালুম। তুমি আর কি চাও লিখো।

বাবা তাঁকে লিখেছিলেন, একটি পার্সিয়ান ছবির ফ্রেম পাঠাতে, নগেন্দ্রনাথের ছবি রাখবার জন্যে। তিনি সেটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বাহিরের সিঁড়ির উপর যে শো-কেস ছিল তাতেই ছোটো কত্তাবাবার ছবি রাখা ছিল সেই ফ্রেমে আঁটা। বাবার মুখে শুনেছিলাম এসব। আমার কেবল মনে পড়ে সেই 'ডল'টির কথা। অনেকদিন পর্যন্ত সেটি নিয়ে আমি খেলা করেছি।

আমার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে, তখন আমি বেথুন স্কুলে পড়ি। মনে পড়ে, সেই সময় বাবার খুব পাখীর সখ হয়েছিল। কতো রকমের খাঁচা তৈরী করে, কতো রং-বেরঙের পাখী পুষেছিলেন। খাঁচার ভিতরে গাছের ডাল দেওয়া হ'লো, বাসা তৈরী হ'লো ডালের ফাঁকে ফাঁকে। আমার দাসী তার দেশ থেকে বাবাকে বাবুই পাখীর বাসা এনে দিত। বাবা সেগুলো গাছে টাঙ্গিয়ে তাতে খাবার দিয়ে রেখে যেতেন —কতো পাখী এসে তাতে আশ্রয় নিতো। বাবা তখন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আঁকছেন—তাঁর জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত। কতো কোকিল শালিক ময়না কিনে বাগানে ছেড়ে দিতেন। এক-একদিন পাখীশুদ্ধ খাঁচার দরজা খুলে দিতেন বাবা। বলতেন, "ওরা আমার বাগানেই থাকবে, কোথাও যাবে না।" মনে হয়, নিজের বাগানেই তিনি বৃন্দাবনের রূপ দেখতে চেয়েছিলেন।

ক'লকাতায় দেখা দিলো প্লেগ মহামারীরূপে। সেই মারীর হাওয়া লাগলো আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। ফুলের মতো আমার ছোট্ট বোনটিকে উড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল আমাদের সংসার-বাগান থেকে।

ডাক্তার পরামর্শ দিলেন কিছুদিনের জন্যে এ-বাড়ী ছেড়ে যাওয়া ভালো—চূণকাম হোক। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মত বাবা আর জ্যাঠা-মশাইরা মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার-কাকার বরানগরের তটিনী-কুটীর আর সুরধুনী-কানন চেয়ে নিয়ে সেখানে চলে গেলেন।

মায়ের মন তখন খুব খারাপ। বরানগরে গিয়ে মায়ের মনকে অন্য কাজে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে বাবা তাঁকে অনেক রকম পাখী কিনে দিতেন। বাচ্ছা টিয়া, চন্দনা, ময়না কিনে তাদের অতি যত্নে বড়ো ক'রে তুলতেন মুসুরডাল সেদ্ধ, ছাতু খাইয়ে। যখন তারা খেতে শিখতো, ডানা মেলে

উড়তে পারতো তখন তাদের ছেড়ে দিতেন। বোধহয় ভাবতেন, নিজের মেয়েকেই ধ'রে রাখতে পারলুম না, পাখীর ছানাকে রাখবো কেমন করে। কোনো পাখীর অসুখ ক'রলে বই দেখে তাকে ওষুধ খাওয়াতেন। তার যদি মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যেতো, তিনি শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে ব'সে থাকতেন স্থিরভাবে। আমার মনে হয় এই পাখীর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নিজের মেয়ের মৃত্যুকে সহজ ক'রে নিতেন মনের মধ্যে—কন্যার শোকের খানিকটা বোধহয় পাখীর দিকে চ'লে যেতো। এও বুঝি তাঁর সাধনার একটা ধারা ছিল।

এই সময়েই বাবা রাজস্থানের ইতিহাস থেকে ছবি আঁকছিলেন। 'সাহজাহানের মৃত্যু' চিত্রখানি সেই সময়েই অয়েল পেন্টিংয়ে এঁকেছিলেন। নিজের অন্তরের সমস্ত বেদনা, বিয়োগ-ব্যথা ঢেলে দিয়েছিলেন ছবিখানিতে, তাই অতো প্রাণবন্ত হয়েছিল ছবিখানি। সেই ছবির জন্যেই দিল্লীর দরবারে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। যেদিন ঐ পদক বাবার কাছে এসে পৌঁছলো, বাবা সবার আগে দিদিমার কাছে গিয়ে বললেন, "মা, আমি সোনার মেডেল পেয়েছি।"

দিদিমার চোখ দিয়ে আনন্দ-অশ্রু গড়িয়ে প'ড়লো; বললেন, "আমার সেই ছোট্ট ছেলে অবন, কতো কালি-ঝুলি-রং মেখে কাপড় নোংরা ক'রতো। কতো ব'কেছি তার জন্যে! সেই রং আজ সোনা হ'য়ে আসবে কে জানতো!"

বোধহয় এই সময়েই, বা, তার কিছু পরে বাবাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অর্থাৎ তাঁর শিল্প সাধনার প্রতি সম্মান দেখানো হ'লো সরকার পক্ষ থেকে।

তার সাধনার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজেকে অন্য সব বিষয় থেকে আড়াল ক'রে সাধনা করতেন না, সকল বিষয়ে নিজেকে মিলিয়ে,

সকল ডাকে সাড়া দিয়েও নিজের কাজ ঠিক ক'রে যেতেন—হয় আঁকা, নয় লেখা—লেখা তো নয় সেও তাঁর আঁকা—ভাষায় রং দিয়ে। সাধনা আর সংসার তাঁর কাছে আলাদা ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীরও হাওয়া ব'দলে গেল। ঘরে ঘরে এলো চরকা। পাবনা আর যশোর থেকে তাঁত এনে বসানো হ'লো। মেয়েরা সকলেই চরকা কাটতেন। তাঁতে বোনা হ'তো নানা রকম নক্‌শা-কাটা শাড়ী, ধুতি, বিছানা-ঢাকা, টেবিল-ঢাকা। বাবা জ্যাঠামশাইরা খুললেন স্বদেশী ভাণ্ডার। বাবা, জ্যাঠামশাইরা এবং রবিদাদা এই সময় আমার স্বামীকেও এই কাজে টেনে নিলেন। আমার স্বামী খুব কম বয়সেই পিতৃহীন হন। বাবা ও জ্যাঠামশাইরা তাই তাঁকে নিজেদের কাছে কাছে রেখে নানা শিল্প ও ললিতকলার চর্চার মধ্যে ওঁকে বড় ক'রে তুলেছিলেন। সেই জন্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সঙ্গে মেশবার এবং ওঁদের কাজের ও ভাবধারা অনুসরণ করবার সুযোগ হ'য়েছিল আমাদের খুবই। তার ফলে আমাদের বাড়ীতেও সকল বিষয়েই ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর ছাপ। আমাদের বাড়ীর ছেলেদের মধ্যেও বিকশিত হ'য়েছিল গান বাজনা ও নানা শিল্পচর্চার ক্ষমতা।

স্বদেশী যুগের কথা বলছিলুম। রবিদাদার জাতীয় ও স্বদেশী সঙ্গীতগুলি প্রায় এই সময়েই রচিত। তিনি একটির পর একটি গান বাঁধতেন আর বাবা সেই গানকে রূপ দিতেন ছবিতে। রবিদাদা গান বাঁধলেন—

“আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী!”

বাবাও তার রূপ দিলেন বর্ণ ব্যঞ্জনায় “বঙ্গমাতা” ছবিতে।

মনে পড়ে রাখী-বন্ধন উৎসবের কথা। রাখী পূর্ণিমার আগের দিন রবিদাদা বাড়ীর সকলকে ডেকে বললেন, “কাল আমরা রাখী-বন্ধন উৎসব ক'রবো। সকলের হাতে রাখী বাঁধবো। দীনু (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আর নির্মল (আমার স্বামী) আমার দুই পাশে গাইবে।”

পরদিন সকালবেলা বাড়ী থেকে দলবল নিয়ে বেরুলেন রবিদাদা। চীৎপুর রোডে এসে তাঁর মনে হ'লো খালি পায়ে চলতে হবে। সকলকে জুতো খুলে ফেলতে বললেন। জুতো খুলে রাখা হ'লো অনুশীলন সমিতির বাড়ীতে। জুতো রেখে জগন্নাথ ঘাটে গিয়ে সকলে স্নান ক'রে সকলের হাতে রাখী বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে চললেন রবিদাদা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে একটির পর একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে। গান শুনে দলে দলে লোক এসে যোগ দিতে লাগলো সেই উৎসবে। ছেলে, বুড়ো, জাতি নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী বাঁধা হ'তে লাগলো। এমন কি সহিস, কোচ্‌ম্যান, কুলী, ট্রেনের ড্রাইভার প্রভৃতি কেউই বাদ প'ড়লো না রবিদাদার রাখী-বাঁধা থেকে। তাঁরা চ'লেছেন গাইতে গাইতে। বাড়ীর বারান্দা থেকে মেয়েরা খই ছড়াচ্ছে পথে। গৃহকর্তারা সরবৎ দিচ্ছেন, মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন তাঁদের। এই ভাবে তাঁর অভিযান চ'লেছে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। চলতে চল্‌তে কোনো এক বিলাতী ভাবাপন্ন ভদ্রলোকের বাড়ীর কাছে এসে তাঁর দলটি থামলো। কিন্তু সেই ভদ্রলোক যোগ দিলেন না তাঁদের সঙ্গে। রবিদাদা সেইখানে দাঁড়িয়েই গান বাঁধলেন—

“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।”

এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে অনেক কাজ বাড়লো বাবার। কিন্তু তখনো দেখেছি বাবাকে ঠিক নিয়মিত পড়াশোনা, লেখা বা ছবি

আঁকার কাজ ক'রে যেতে। কখনও চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখি নি তাঁকে। বড়ো শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন তিনি। কোনো গোলোযোগে যেতে ভালোবাসতেন না। তাই ব'লে যে তিনি ভীরু প্রকৃতির ছিলেন তা নয়। বাড়ীর কোনো বিপদে-আপদে, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, আমলা-সরকার প্রভৃতি সকলের বিপদে তিনিই গিয়ে দাঁড়াতেন সবার আগে। আগেই বলেছি তিনি সকল আন্দোলনেই যোগ দিতেন দেশের ও দশের উন্নতিমূলক যদি তা হয়। রবিদাদার স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পাণ্ডাই ছিলেন বাবা। তাঁর মুখে শুনেছি কতো কথা—তাঁর "ঘরোয়া" বইখানায় সে-সব লিখে গেছেন। "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থেও বাবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যে-বছর প্রদ্যুৎকাকার বরানগরের বাগানবাড়ীতে গিয়ে আমরা ছিলুম, তার পরের বছর প্লেগের আশঙ্কায় শীতকালে চৌরঙ্গীতে একটা মস্ত বাগানওয়ালা বাড়ী ভাড়া করে জোড়াসাঁকোর বাড়ী শুদ্ধ সকলেই গেলেন সেখানে, আমিও গেলুম। বাবার পাখীর সখ তখনও ছিল।

এখানে এসে, সখ হ'লো ঘুড়ি ওড়াবেন। আমার শ্বশুরমশাইকে বললেন, "ও সব ছোটো ঘুড়ি ওড়াতে আমার ভাল লাগে না। তুমি খুব বড় ঘুড়ি নিয়ে এস যা কেউ কাটতে পারবে না।"

বাবামশাই খুব বড় ঢাউস ঘুড়ি নিয়ে এলেন। কিন্তু সুতো তো একই, সে ঘুড়ি গেল কেটে। কাছেই ছিল আর্মি-নেভির দোকান। সেখানে লোক পাঠানো হ'লো কাটবে না এমন ঘুড়ি চাই। তারা বক্স কাইট্ ঘুড়ি দিলে। টোন সুতোয় ঘুড়ি ওড়ানো হলো। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুড়ি উঠলো আকাশে। অন্য যত ঘুড়ি উড়ছিল আমাদের ঘুড়ির কাছ থেকে সব সরে গেল। একটা খুঁটি পুঁতে ঘুড়ির সুতো তাতে বেঁধে দিয়ে বাবা

একটা চৌকিতে ব'সে তামাক খেতে লাগলেন। খুব আনন্দ। বললেন, "দেখলে তো, সবাইকে হারিয়ে দিলুম। এ বেশ। তামাক খাওয়াও হচ্ছে, ঘুড়িও ওড়ানো হ'চ্ছে।"

এমনি কত রকম মজা করে যে আনন্দ পেতেন শিশুর মত-তা বলে শেষ করা যায় না।

আর একটা ছোট্ট মজার কথা মনে পড়লো—সেবার জোড়াসাঁকোয় "ফাল্গুনী" অভিনয় করাচ্ছেন রবিদাদা। দশটাকা ক'রে টিকিট। মায়ের শরীর খারাপ হ'য়েছিল ব'লে মা অভিনয় দেখতে যান নি। আমি আমার মেজছেলে বুড়োকে নিয়ে মাকে দেখতে গেছি। মা বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই ফাল্গুনী দেখতে গেলি নে?"

বুড়ো বললে, "দশটাকা ক'রে টিকিট। আমি যাবো না।"

মা তখুনি তাকে দশটা টাকা দিয়ে বললেন, "যা দেখে আয়।"

বাবা সেখানে বসে ছিলেন। বললেন, "দাও আমাকে টাকাটা।" এই বলে টাকাটি নিয়ে বুড়োকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলেন। তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "মেজবাবু এসেছেন, আমার পাশে একটা চেয়ার দাও।"

সকলে ভাবলে আমার মেজ জ্যাঠামশাই আসছেন বুঝি। তাড়াতাড়ি বাবার পাশে একটা চেয়ার দিয়ে গেল। অভিনয় দেখে বুড়ো যখন ফিরলো মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে টিকিট পেয়েছিলি? ভালো জায়গায় বসতে পেয়েছিলি তো?"

বুড়োর চোখ ছোটোবেলা থেকেই খারাপ—তাই মার ভাবনা, সে ভালো ক'রে দেখতে পেলে কি না!

বুড়ো বললে, "আমার টিকিট লাগে নি। দাদামশাইয়ের পাশে ব'সে খুব ভাল ক'রে দেখেছি।"

বাবাও সেই সময় ঘরে ঢুকেছেন। মা বললেন, "কই, টাকা কই!"

বাবা বললেন, "ও একবার যখন বাক্সা থেকে বেরিয়েছে, আর বাক্সে উঠবে না।"

মা বললেন, "গেল। হয় কাকেও দান ক'রে বসবেন। নয়তো হারিয়ে ফেলবেন!"

তারপর মা যেই অন্যমনস্ক হ'য়েছেন, বাবা অমনি বুড়োর পকেটে টাকাটা পুরে দিয়ে চুপি চুপি বললেন, "খেলনা কিনো।" তাঁর নির্মল আনন্দের নমুনা সব এই রকমের।

মেজদিদি সেখানে প্রায়ই আসতেন। একদিন তিনি এসে বাবাকে বললেন, "অবন, হ্যাভেল সাহেব বলছেন গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে তোমায় চাকরী নিতে হবে।"

তাঁর কথা শুনে বাবা তো ভয়েই অস্থির; বললেন, "আমি এ বেশ আছি পাখী-টাখী নিয়ে। ও মাস্টারী—চাকরী আমার পোষাবে না।"

দিদিমা, জ্যাঠামশাইরা, সকলে বুঝিয়ে বলতে তবে বাবা রাজী হ'লেন। তিনি বললেন, "আমি একলা যেতে পারবো না।"

তখন বাবামশায় (আমার শ্বশুর ৺নলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) বললেন, "আচ্ছা অবনবাবু, আমি তোমাকে রোজ অফিসে পৌঁছে দেবো আর নিয়ে আসবো।"

বাবামশায় কর্পোরেশনের ক্যাশিয়ার ছিলেন। কর্পোরেশনের অফিসে কাছেই আর্ট স্কুল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বাবাকে প্রত্যহ অফিসে পৌঁছে দিতেন আর নিয়ে আসতেন।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর অফিস যাওয়া যখন ঠিক হলো তখন বাবা দিদিমাকে বললেন, "ওই ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ক'রে আমি চাকরী করতে যেতে পারবো না।"

তাই বাবার জন্যে একখানা ব্রুহাম গাড়ী, লাল কম্পাশ, আর ঘোড়া কেনা হ'লো। গাড়ীর ত ব্যবস্থা হ'লো। তারপর বিশ্বম্ভর বেহারাকে বাবা বললেন, "ওরে অফিস ত যাবো, কিন্তু তামাক যে খেতে পাবো না। কি হবে?"

বিশ্বম্ভর গিয়ে অমনি দিদিমাকে বললে সে কথা।

দিদিমা তাকে বললেন, "ওরে, তামাকের সরঞ্জাম সব কিনে নিয়ে অফিসের বেহারাকে জিম্মে ক'রে দিয়ে আসিস।" তামাক খেতে না পেলে পাছে ছেলের শরীর খারাপ হয়, তাই বিশ্বম্ভরকে ব'লে ঐ ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। মাকে ব'লে দিলেন, "তুমি ভোরে উঠে ডাল আর মাছের কালিয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিও, নইলে ওর ভালো ক'রে খাওয়া হবে না।" ছেলেদের উপর স্নেহদৃষ্টি ছিল তাঁর এমনই। এত আদর আবদারের মধ্যে মানুষ হ'য়েও কি মহৎ চরিত্র, কি সরল অমায়িক স্নেহময় মানুষ ছিলেন ওঁরা।

আর্ট স্কুলে কাজ করবার সময়েই বাবা প্যাষ্টেল পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন অনেকগুলি। একবার তাঁর সখ হ'লো প্যাষ্টেলে সকলের মুখ আঁকবেন। এক এক ক'রে অনেকের ছবিই আঁকা হ'লো। একদিন আমার স্বামীকে বললেন, "এসো, এবার তোমার একখানা ছবি আঁকি।"

বসলেন আমার স্বামী তাঁর নির্দেশ মত। প্রথম দিন 'স্কেচ'টা তৈরী ক'রে তাঁকে ব'লে রাখলেন পরদিন সকালেও ঠিক ওইভাবে বসতে—রং দিয়ে ছবি শেষ ক'রবেন।

পরদিন সকালে মা আমাদের নিয়ে গেলেন নিউ মার্কেটে। ওঁকেও যেতে হ'য়েছিল। মা বললেন, "মার্কেট থেকে ফিরে সিটিং দিলেই হবে।"

কেনা-কাটা ক'রে ফিরে এসে দেখি বাবা গুম্ হ'য়ে ব'সে আছেন, তাঁর আঁকবার আসনে। মাকে ত খুব বকলেন। বললেন, "আমি

সারারাত ধরে ভেবেছি কোনখানে কোন রং দেবো। আর সকালে দেখি সব উধাও!"

আমরা সকলে কত বললুম আঁকবার জন্যে। কিন্তু তিনি বললেন, "আর হয় না। ক্ষণও চ'লে গেছে, মনও চ'লে গেছে।"

আর সে ছবি আঁকলেন না। এখন মনে হয় কেন সেদিন তাঁকে বাজারে নিয়ে গেলুম। তা না হ'লে তিনি চ'লে গেলেও বাবার হাতে আঁকা তাঁর ছবিখানি আজও থাকতো।

বাবা আমার শ্বশুরমশাইয়ের একখানি ছবি প্যাষ্টেলে এঁকেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু এখনও সে ছবি দেখলে মনে হয় জীবন্ত মানুষ।

তখন প্রতি বছর গরমের সময় বাইরে কোথাও যাওয়া হ'তো। বাবাকে লক্ষ্য ক'রে দিদিমা বলতেন—"ও সারা বছর খাটে, গরমের সময়টা একটু চেঞ্জে যাক।" সেই জন্যে প্রায় নিয়ম করেই যাওয়া হতো বাইরে। কোন-কোনবারে জোড়াসাঁকোর বাড়ীশুদ্ধ সকলেই যেতেন। কোন বার বা বাবাই যেতেন, আমাদের সকলকে নিয়ে। আমায় সঙ্গে না নিয়ে তিনি বিদেশে যেতেন না। যে বার আমার যাবার সুবিধা হতো না, বাবা যেখানেই যান সেখান থেকে যে কতো পোষ্টকার্ড এঁকে এঁকে পাঠাতেন আমাকে তার হিসেব নাই। বাবার যা দেখতে ভালো লাগতো, সেই ভালো লাগার স্বাদ আমিও যাতে পাই, তার জন্য তাঁর এই খেয়াল! শিল্পীর চোখে যা দেখতেন, তাকেই ধ'রে রাখতেন রং-তুলির সাহায্যে।

একবার আমরা তখন পুরীতে। আমরা সকলে সমুদ্রের তীরে বেড়াতে গেছি। করুণার (আমার মেজ বোন) ছোট ছেলে শোভনলাল তখন সবেমাত্র চলতে শিখেছে। বাড়ীর সামনে বালির চড়ায় বসে সে খেলা ক'রছিল উঁচু উঁচু বালির টিপির আশেপাশে। আমরা ফিরে আসতেই বাবা করুণাকে একখানা ছবি দিয়ে বললেন, "এই নাও, কোনটা তোমার ছেলের মাথা, আর কোনটা বালির চড়া খুঁজে বার করো।"

তিনি সেটি এঁকে ফেলেছেন আমাদের বেড়াতে যাওয়ার অবকাশে। অবাক হ'য়ে দেখি সত্যিই ত! বালির ছোট্ট টিপির মাথাতেও দু' চারটে ঘাস গজিয়েছে, শোভনের মাথাতেও তেমনি একটু-একটু চুল গজিয়েছে। মনে হ'চ্ছে দুটি ছেলে প্রকৃতির কোলে পাশা-পাশি ব'সে খেলা করছে।

এ ত গেল দেখেই এঁকে ফেলার কথা। আর একটা ঘটনা বলি, মনশ্চক্ষে কেমন দেখতে পেতেন হুবহু, তারই নমুনা।

সেবার আমরা অনেক জন এসেছি পুরী। বাবা-মা কলকাতাতেই আছেন। আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন আমার এক কত্তা-মা। কলকাতা থেকে পুরীতে বাবা আমাদের একটি সমুদ্র-স্নানের ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলেন। আশ্চর্য হ'য়ে দেখলুম—আমার স্বামী কত্তামাকে যে ভাবে ধরে স্নান করাচ্ছেন এবং আমি যেমন ক'রে ঢেউ নিচ্ছি সমস্ত দৃশ্যটি হুবহু। এখনও আমার কাছে সে ছবিটি সেই দিনের স্মৃতি চিহ্ন হ'য়ে রয়েছে।

আর একবার বাবার সঙ্গে পুরী গেছি। সমুদ্রের ধারে "পাথার পুরী" বাড়ীতে তখন ওঁরা গিয়ে থাকতেন। বাড়ীটার নাম বাবাই দিয়েছিলেন। সেবার বাবার সখ হ'লো কোণারক দেখতে যাবার। মা জিজ্ঞাসা করলেন বাবাকে যে, তিনি একলা যাবেন নাকি! বাবা ব'ললেন যে, মা, আমার মেজো বোন করুণা আর আমিও যাবো। সঙ্গে গিয়েছিলেন মৃণার

সাহেব। তখন আমার বড়ছেলে মুলুক আর মেজ বুড়ো খুব ছোটো। করুণার দুই ছেলে মোহন আর শোভনও ছোটো। মারও কোকো আর খুকী খুব ছোটো, কেবল অলক একটু বড় হ'য়েছে। অলক বাড়ীতে রইল, জামাইরা এলে তাদের সঙ্গে যাবে। পাঁচটা পাল্‌কীর ব্যবস্থা হ'লো। তখনকার দিনে ভাড়া হ'লো ষোলো টাকা ক'রে। প্রত্যেক পাল্কীতে আট জন করে বেহারা, একটা ক'রে লণ্ঠন নিয়ে রাত আটটার সময় যাত্রা করা হ'লো, ভোরবেলা চন্দ্রভাগায় সূর্যোদয় দেখতে পাবো ব'লে। পাঁচখানা পাল্কীতে সকলে উঠলুম ভাগাভাগি করে। খাবার জলের পাত্র আর গেলাস একটা করে প্রত্যেক পাল্কীতেই রইল। বাবা আর আমি পাশা-পাশি দুটো পাল্কীতে।

সমুদ্রের ধারে ধারে গিয়েছে পথ। চাঁদনী রাত, বেহারাদের বোল শুনতে শুনতে চলেছি—ধু-ধু করছে বালি, তার মাঝে পথ। বাবার মুখে র'য়েছে 'সিগার', তার আগুনে মাঝে মাঝে পাল্কীর ভিতরটায় আলো হ'য়ে উঠছিল। বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছেন— আমাকেও দেখাচ্ছেন, কোথাও বা তেশিরা মনসার গাছ, কোথাও বা পড়ে রয়েছে মড়ার খুলি। ভয়ও হচ্ছিল খুব, অথচ ভালোও লাগছিল বেশ।

রাত তিনটের সময় আমাদের পাল্কীগুলো এসে নামলো রামচণ্ডীর চটিতে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার পাল্কী তুললো বেহারারা। এর আগেও দু' এক জায়গায় বিশ্রাম ক'রতে হ'য়েছিল। কত কি দেখাতে দেখাতে বলতে বলতে চ'লেছেন বাবা, পাল্কী বেহারাদের একটানা সুরে বোল শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ঘুমও এসে যাচ্ছিল, আবার উঠে প'ড়েছি। এই ভাবে ভোর সাড়ে চারটের সময় আমরা এসে পৌঁছলুম চন্দ্রভাগায়। এই জায়গাটা সমুদ্রের ধারে। আমরা যখন পৌঁছলুম তখন ঝির্-ঝির্ ক'রে ভোরের হাওয়া বইছে। চারিদিক পরিষ্কার হ'য়ে গেল,

ধীরে ধীরে পূব আকাশ লাল হ'য়ে উঠতে লাগলো। তারপর দেখলুম সমুদ্রের তলা থেকে যেন একটা সোনার বল নাচতে নাচতে উঠছে— সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সূর্যও নেচে নেচে উঠছেন। আমরা মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলুম। এই জায়গায় সমুদ্র এমন ভাবে ঘুরে গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশেছে, মনে হয় যেন একটু এগিয়ে গেলেই সূর্যকে ধরতে পারা যাবে।

এখান থেকে কোণারক খুব কাছে। কিছুদূর এগোবার পরই সূর্য-মন্দির দেখা গেল। বিরাট কষ্টি-পাথরে খোদাই করা মানুষ-প্রমাণ ন'টি দেবতার মূর্তি—নবগ্রহ। বাবা সেগুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। আরও বললেন, "এই মূর্তিগুলিকে মন্দিরের মাথা থেকে নামিয়ে ক্রেণে ক'রে জাহাজে তুলে মিউজিয়ামে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন সাহেব কোম্পানি। জানি না, কতদূর সফল হবেন তাঁরা। দেবতার মূর্তি নড়ানো কি সাধারণ কথা!" এমনি ছিল তাঁর বিশ্বাস।

আগে আমরা গিয়ে উঠলুম ডাক বাংলোতে। সেখানে সকলে মুখ হাত ধুয়ে চা জলখাবার খেয়ে নিলুম। দুপুর বেলাকার লাঞ্চের ব্যবস্থা ক'রতে বলা হ'লো বাবুর্চিকে। তারপর বেরোনো হ'লো মন্দির দেখতে। দূর থেকে মন্দিরটা দেখাচ্ছে যেন একটা বিরাট পাথরের রথ বালিতে খানিকটা ব'সে গেছে। এর আগে বাবার 'রাজকাহিনী'-তে শিলাদিত্যের কথায় পড়েছি সূর্য মন্দিরের কথা। এই কি সেই রথ? যতই তার কাছে এগোচ্ছি বুক দুর-দুর করছে। আস্তে আস্তে চলেছি বাবার কাছে কাছে। মুখে সিগার আর হাতে লাঠি রয়েছে বাবার। লাঠি দিয়ে সেই রথের চাকার কারুকার্যগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে বোঝাচ্ছেন। বাহিরের সব খুঁটিনাটি দেখা হ'লে পর মন্দিরের ভিতরে গেলুম।

গা শিউরে উঠলো ভিতরে ঢুকেই। কালো কষ্টি-পাথরের সাতটা

ঘোড়ার মুখ জেগে রয়েছে—যেমনটি পড়েছি 'শিলাদিত্য'-কাহিনীতে। সেই ঘোড়াগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন, "দেখ, কে যেন আজই পালিশ ক'রেছে!"

মন্দির দেখা শেষ ক'রে বাংলোতে খাওয়া দাওয়া সেরে পাল্কীতে উঠলুম। ফেরবার পালা। রাত্রি দশটার সময় বাড়ীতে এসে পোঁছনো হ'লো।

এই কোণারক-যাত্রার পর বাবার 'ভূতপত্রীর দেশ' বইখানি লেখা হয়। এই বইটির মধ্যে যে রোমাঞ্চকর পথের বর্ণনা আছে পাল্কী চ'ড়ে যাবার, সেটার উৎস হ'লো কোণারক যাবার 'ভূতুড়ে' পথ। যাবার সময় যেমন গা ছম্‌ছম্‌ ক'রেছিল, পড়লেও তেমনি ভয়-মেশানো বিস্ময় জাগে মনে।

বাবার এস্‌রাজে হাত ছিল সে-কথা এর আগেই বলেছি। এই বাজনাটা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। অন্যান্য যন্ত্রেও তাঁর অল্পবিস্তর দখল ছিল। তা ছাড়া জোড়াসাঁকোর বাড়ীর আবহাওয়াতেও ছিল গান-বাজনা-অভিনয়ের আমেজ। একদিন বালীগঞ্জের মেজদিদি (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) বললেন, "অবন, বৌমাদের নিয়ে একটা অভিনয় করাও।"

যেমনি প্রস্তাব তেমনি প্রস্তাবনা ঃ বই বাছা হ'লো 'রত্নাবলী নাটক'। রাজা সাজলেন বড় পিসি (বিনয়িনী দেবী) ; রাণী, বড়মা (গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) ; মন্ত্রীর ভূমিকা নিলেন মেজমা (সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী); বাসবদত্তা সাজলেন ছোটপিসি (সুনয়নী দেবী) ; সখী চ্যুত-লতিকা আমার মা ; বিদূষক সেজেছিলেন শিমলের দিদি।

দৃশ্যপট আঁকলেন হরিশবাবু আর বাবা। সাজাবার ভার নিয়েছিলেন মেজদিদি, যামিনীদাদা আর বাবা। দৃশ্যপট পরিবর্তন করা অর্থাৎ মঞ্চসজ্জার কাজ ক'রেছিলেন যামিনী-দাদা আর বাবা। ওবাড়ীর একটি ছেলে, বলুকাকা ছিলেন স্মারক। মণীষা পিসি গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজিয়েছিলেন। তিনি খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। তিনি তখন আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন, তিনি এলেই বাবা তাঁকে পিয়ানো শোনাতে বলতেন। তাঁর পিয়ানো বাজানো বড়ো ভালো লাগতো বাবার।

হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম। ষ্টেজ বা মঞ্চ তৈরী হ'য়েছিল তেতালার হলঘরে! পূব দিক ঘেঁসে। কী চমৎকার হ'য়েছিল সে অভিনয়!

এ ছাড়া বাবা ও জ্যাঠামশায়দের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের অনেকবার হ'য়েছিল—বাড়ীতেই হ'তো। ওঁরা যখন মঞ্চে উঠতেন অভিনয় ক'রতে তখন আর ওঁদের বাড়ীর মানুষ ব'লে চেনবার কিছু থাকতো না; যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন হুবহু সেই মানুষ হ'য়ে যেতেন।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দিয়েও অভিনয় করাতেন। একবার আমাদের দিয়ে 'আলিবাবা' অভিনয় করিয়েছিলেন। বাবা সাজাবার ভার নিয়েছিলেন। বেশ মনে পড়ে, কতো সহজে বাবা-'মেক্‌-আপ' করে দিতেন। ডাকাত সাজাতে হবে, চুলের দাড়ি গোঁফ পরতে ছেলেরা রাজী নয়। বাবা ক'রলেন কি, একটা কর্কের ছিপিকে কাঁটায় আটকে তার মুখটা মোমবাতিতে পুড়িয়ে নিয়ে সেই কালি দিয়ে দাড়ি গোঁফ এঁকে দিলেন।

বাবা নিজে কমিক পার্ট নিতেন, তাই অভিনয়ে রবিদাদা তাঁর সব নাটকে বাবার জন্যে একটি ক'রে কমিক পার্ট রাখতেন।

ক'লকাতায় রবিদাদার কোনো নাটকের অভিনয় হ'লে মঞ্চের দৃশ্য

সজ্জা আর অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাজসজ্জার ব্যবস্থাপনা করতে হতো বাবাকে। তা'ছাড়া শিশির ভাদুড়ী মশাই, অহীন্দ্রবাবু প্রভৃতি প্রায়ই আসতেন বাবার কাছে অভিনয় সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে। বাবাকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন অভিনয় দেখাতে।

অভিনয় ছাড়া নাচ, গান-বাজনা শোনার সখ ছিল তাঁর খুব। শুধু তাই নয়, ভালো কিছু দেখলে বা শুনলে প্রিয়জনদের তা শোনাতেও ভালো-বাসতেন। একবার আমার স্বামী তখন এলাহাবাদে আছেন, বাবাও গিয়েছেন। আমার স্বামী লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলেন। তাঁর কথা শুনে বাবা বললেন—"যদি লক্ষ্ণৌ যাও তাহ'লে কাল কবিন্দের নাচ দেখে এসো।" কাল কবিন্দ লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ছিলেন। বাবা তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তিনিও বাবাকে কতখানি শ্রদ্ধা ক'রতেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে নীচেকার বিবরণ থেকেঃ আমার স্বামী লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসে যা বলেছিলেন—

লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে তো অনেক খুঁজে কাল কবিন্দের বাড়ী খুঁজে বার করলুম। বারাণ্ডায় একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—'এইটাই কি কাল কবিন্দ সাহেবের বাড়ী?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এইটাই তার বাড়ী। আপনি কাকে চান?'

'আমি কাল কবিন্দ সাহেবকে চাই।'

বৃদ্ধ বললেন, "আমিই কাল কবিন্দ।"

তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলুম। ভাবলুম, এই বৃদ্ধ কি ক'রে নাচবে! যাই হোক, আমি বললুম, 'আমি অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের জামাই। তাঁর কাছ থেকে আসছি। তিনি আমাকে আপনার নাচ দেখে যেতে বলেছেন।

কবিন্দ সাহেবের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। বললেন, 'ঠাকুরমশাই যখন বলেছেন তখন আপনাকে নিশ্চয় নাচ দেখাবো। কিন্তু, আজ তো হবে না। আমার বাজিয়েকে খবর দিতে হবে। কাল সন্ধ্যার সময় আপনি আসবেন।'

পরদিন সন্ধ্যার সময় গেলুম তাঁর বাড়ীতে। কবিন্দ সাহেব নাচের পোষাক প'রে আসরে এলেন। আরম্ভ হলো নাচ। তাঁর নাচ দেখতে দেখতে ভুলেই গেলুম যে এক বৃদ্ধ নাচছেন; মনে হ'লো যেন এক তরুণ যুবক নাচছে—কি তাঁর ভঙ্গী, কি তাঁর ভাব! তাঁর নাচের মধ্যে দেখতে পেলুম প্রবীণের নবীনতাময় অটুট শিল্পদক্ষতার অপূর্ব প্রকাশ।

গুণীকে চেনবার শক্তি বাবার ছিল অসাধারণ। যার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখতেন সেটি মনে করে রাখতেন। অপরকে সেটি দেখাবার আগ্রহও ছিল তেমনি। অপরে দেখে আনন্দ পেলে তিনি খুব খুসী হতেন। বাবা এই স্বভাবটি পেয়েছিলেন আমার দিদিমার (ঠাকুরমা) কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে দিদিমার আমুদে স্বভাবের একটা উদাহরণ দিই।

এলাহাবাদেই তখন আমরা ছিলুম। রোজ বিকালে দিদিমা আমাদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন। দিদিমা, আমার স্বামী আর আমি। চলে যেতুম বেড়াতে। পশ্চিম অঞ্চলে সন্ধ্যার দিকে দোকানপাট জমতো খুব; আলো দিয়ে সাজানো হতো সব। দিদিমার সঙ্গে থাকতো একথলি টাকা পয়সা। চকে গিয়ে আমাদের দু'জনকে নিয়ে এ-দোকান সে-দোকান বেড়িয়ে জিনিষ কিনতেন, খাবার কিনতেন প্রত্যহ।

একদিন একটা দোকানের সামনে দেখা গেল খুব ভিড়। দিদিমা আমার স্বামীকে বললেন, দেখতো কিসের এত ভিড়। তিনি দেখে এসে

বললেন যে, একজন কচুরিওয়ালী কচুরি ভাজছে আর লোকে খুব কিনছে। দিদিমা বললেন, "নিশ্চয় খুব ভাল কচুরি, চল দেখি, কিছু কিনে নিয়ে যাই।

দোকানের সামনে আমাদের গাড়ী দাঁড় করানো হলো। ভিড় পাতলা হতে দেখা গেল, আঠারো উনিশ বছরের একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে কচুরি ভাজছে আর বিক্রী করছে—যেন মা অন্নপূর্ণা খাবার বিলোতে বসেছেন দুই হাতে। তাকে দেখে দিদিমা বললেন, "তাই এত ভিড়। যা, যা তুইও কিছু কচুরি কিনে নিয়ে আয়।"

বাড়ী ফিরে এসে দিদিমা সকলকে ডাকলেন, জ্যাঠাইমাদের, জ্যাঠা-মশাইদের আর মা বাবাকে। সকলকে ডেকে ডেকে বললেন, "তোদের জামাই কি সুন্দর একটি কচুরিওয়ালি বের করেছে! যেমন তার রূপ, তেমনি তার কচুরি। কাল তোদের সকলকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো।"

আমার স্বামী ত বেজায় অপ্রস্তুত। কেবল বলেন, "আমি আবার কখন বের করলুম! আপনিই ত তাকে বের করলেন। আপনিই ত কচুরি কিনলেন।"

দিদিমা খালি হাসেন আর বলেন, "আমি ত নই, তুই।" এমনি ছিলেন রহস্যপ্রিয় তিনি। পরদিন সন্ধ্যায় সকলকে নিয়ে গিয়ে সেই কচুরি-ওয়ালীকে দেখিয়ে নিয়ে এসে তবে নিশ্চিন্ত। দিদিমা যখনই বাইরে বেরুতেন সঙ্গে যে টাকা পয়সা নিয়ে বেরুতেন তা থেকে জিনিষপত্র কিনে ভিখারীদের দিয়ে থলিতে যা পড়ে থাকতো তা আর বাক্সে তুলতেন না। সঙ্গে যে যেতো তাকেই দিয়ে দিতেন। বাড়ী ফিরতি থলিতে কম করে পাঁচ দশ টাকা প্রায় থেকে যেতো। দিদিমার থলির ঝড়তি পড়তি পেয়ে পেয়ে আমি প্রায় হাজার টাকা জমিয়ে ছিলুম। দিদিমার এই স্বভাবটিও বাবার মধ্যে দেখেছিলুম। কোনো খরচের জন্যে কিছু নেবার

পর তা থেকে যা বাঁচতো সেটা তিনি দিয়ে দিতেন যে কাছে থাকতো তাকেই।

নাচ গান সম্বন্ধে তাঁর রুচি ছিল উচ্চাঙ্গের। কার কোন্ বিষয়ে দক্ষতা তাও তাঁর মনে থাকতো। একবার তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে ধরলেন ভাল নাচ দেখাবার জন্যে। তিনি তখন প্রথম চাকরীতে ঢুকেছেন আর্ট স্কুলে। বাবা দিদিমাকে সে-কথা জানালেন।

দিদিমা বললেন, "শুধু ত নাচ দেখানো হবে না, একটু খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে।"

তাই হলো। একটু খাওয়া দাওয়া নয় রীতিমত ভূরিভোজের আয়োজন হলো। শ্যামসুন্দর ওস্তাদের উপর ভার পড়লো সব চেয়ে ভালো নাচিয়ে গাইয়ে নিয়ে আসার জন্যে। বিদ্যাধরী বাঈজীকে ঠিক করা হলো। রাত্রি নটায় আসর বসলো, সকলের খাওয়া দাওয়ার পর। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর হলঘরে আসর হয়েছিল। হলের পাশের ঘরে মেয়েদের বসবার ব্যবস্থা হলো নেটের পর্দার আড়ালে। হলঘর ভর্তি লোক।

বাঈজী আসরে নামলো। তার চেহারা দেখে নাটোরের মহারাজা বাবাকে বললেন, "অবনবাবু, টাকাগুলো জলে দিলে। এই চেহারা, এ কি গাইবে, নাচবেই বা কি।"

বাবা বললেন, "রোসো না হে, অত ব্যস্ত কেন? আগে শোনো, ছ্যাখো তারপর বোলো। শহরের সবচেয়ে বড় নাচিয়ে গাইয়ে নামকরা বাঈজী।"

গান আরম্ভ হলো। প্রথমে ধরলো ইমন কল্যাণ। গানের সঙ্গে ভাব বাত্‌লাতে লাগলো। কি তার গলা আর কি তার তাল লয় জ্ঞান! গান শেষ হলে মহারাজা বললেন, "সত্যি চমৎকার।"

বাবা বললেন, "এইবার তাহ'লে নাচতে বলি?"

বাঈজীকে নাচতে বলা হলো। বাঈজী বললে, তার পায়ের তলায় একটা সাদা চাদর পেতে দিতে। তাই দেওয়া হলো। আরম্ভ হলো নাচ। ভেরুয়া সারেঙ্গী ধরলো তবলা। এবার আর গান নয়, শুধু নাচ। তবলার তালে তালে পা সরতে লাগলো বাঈজীর। কি তার পায়ের ছন্দ আর গতি। পায়ের তলায় ফুটে উঠলো একটি পদ্মফুল। নাচ শেষ হলে আসর শুদ্ধ লোক অবাক হয়ে দেখলে তার পায়ের তলায় ফুটে ওঠা সেই পদ্ম। মহারাজা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তার নাচের। তারিফ করলেন বাবার নির্বাচন শক্তির।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন যে কেবল গান-বাজনা-অভিনয়ের উৎস ছিল তা নয়, সাহিত্য ও ললিত কলার পীঠস্থান ছিল বলতে হবে। কতো সাহিত্যিক, কতো শিল্পী যে আসতেন বাবার কাছে! দোতলার দক্ষিণের বারাণ্ডা সরগরম হয়ে উঠতো আলোচনা গল্প হাসি-তামাসায়। তখন বাংলায় কোনো নূতন লাটসাহেব বা হোমরা-চোমরা কোনো বিদেশী কলকাতায় এলেই বাবার ছবির সংগ্রহ দেখতে আসতেন। লাটসাহেব আসবেন শুনলে বাবা ছেলেমানুষের মত ভয় পেতেন—কি হবে, কি হবে? তাঁরা কেউ এলে জ্যাঠামশাইদের এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে পিছনে থাকতেন। একবার আশু মুখুজ্জে মশাই এসে বাবাকে বললেন—

"আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে-শিল্প-কলা (আর্ট) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে তিনমাস অন্তর। তার জন্যে—প্রতি মাসে মোটা রকম দক্ষিণা দেওয়া হবে।"

বাবা শুনে বললেন, "আবার টাকা কেন? আমি এমনিই লিখে দেবো, আপনারা প'ড়ে দেবেন। বক্তৃতা শুনে কে আবার ইট পাটকেল ছুড়বে। আমি ওতে নেই। আর, তাছাড়া আমায় প্রতি বছর চেঞ্জে যাওয়া চাই, ও আমার হবে না।"

আশুবাবু কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত বাবাকে লেকচার দিতে হলো। এই বক্তৃতাগুলোই 'বাগীশ্বরী প্রবন্ধাবলী' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন।

একবার জাপান থেকে কয়েকজন চিত্রশিল্পী এলেন বাবার কাছে। বাবা তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন আমাদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ছবির বিষয়। তাঁরা বড় বড় ফ্রেমে আঁটা সিল্কের কাপড়ের উপর আঁকতেন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, দোললীলা, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ প্রভৃতি। তাঁরা আঁকতেন ব'সে ব'সে আর জ্যাঠামশাইরা তাঁদের কাছে ব'সে দেখতেন, বাত্‌লে দিতেন কোথায় কেমন হবে।

এই জাপানী শিল্পীদের কাছ থেকে বাবা শিখে নিলেন কেমন করে বড় গাছকে ছোট রাখতে হয় আর জ্যাঠামশাই শিখে নিলেন সিল্কের উপর ছবি আঁকার কৌশল। যার কাছে শেখবার যা পেতেন তাই শিখে নেবার ছিল এমনি আগ্রহ। আবার শিক্ষার্থীকে শেখাতে বা দেখাতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি ত ছিলোই না—ডুবে যেতেম সেই কাজে। বাবা যখন আর্টস্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান আর্ট সোসাইটি' গড়ে তুললেন জ্যাঠামশাইদের নিয়ে, অনেক ছেলে আসতো ছবি আঁকা শিখতে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতি বৎসর ছবির প্রদর্শনী হ'তো। প্রদর্শনীতে

বাবা নিজের ছবি বেশী দিতেন না, ছাত্রদের আঁকা ছবিই থাকতো বেশী।

আমি একবার জিজ্ঞাসা করলুম, "বাবা, তুমি এতো আঁকো, একজিবিশনে দাও না কেন ?"

বাবা বললেন, "ওরে, আমার ছবি দিলে ছাত্রদের ছবি বিক্রী হবে না যে। তাই দিইনি।" ছাত্রদের উন্নতি হবে, নাম হবে, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। ছাত্রদের উপর স্নেহমমতা ছিল ঠিক নিজের ছেলের মত। নিজের শরীর খারাপ হয়েছে, তখন অন্য যে-কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত হতেন, কিন্তু ছাত্রদের কেউ এলে খুব খুসি হতেন, বলতেন, "ডেকে আনো"। কোনো ছাত্রের অসুখের খবর পেলে, যদি ক'লকাতায় হ'তো নিজে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। ক'লকাতার বাইরে হ'লে চিঠি লিখে অথবা টেলিগ্রাম ক'রে খবর নিতেন। যেখানে দরকার মনে করতেন, টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। সে কথা কাউকে বলতেন না।

আমার পিসিমা সুনয়নী দেবীও ছবি আঁকতেন। তাঁর ছবির ধরণ ছিল পটের মত। বাবা তাঁর ছবি দেখে খুব খুসী হতেন। তাঁকে বলতেন, "তোর ছবি একেবারে তোর নিজস্ব জিনিষ! তুই এঁকে যা।"

তাঁর উৎসাহে পিসিমার খুসীর সীমা থাকতো না। পিসিমা বলতেন, আমি সার্টিফিকেট চেয়েছিলুম অবন দাদা বললেন, তোর সার্টিফিকেট তুই নিজেই পাবি।"

আমার মেজ বোন করুণা মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে মারা গেল, দুটি ছেলে এক মেয়ে রেখে। বাবা শোকে মুহ্যমান হ'য়ে প'ড়লেন। ছবি

আঁকা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। চুপচাপ ব'সে থাকেন আর করুণার ছেলে মেয়েদের ভুলিয়ে রাখেন, তাদের নানা রকম গল্প শুনিয়ে।

একদিন এক ভদ্রলোক এসে বাবাকে বললেন, "লোকে বলছে অবনীবাবুর লেখা, ছবি আঁকা শেষ হ'য়ে গেল। আর পারবেন না।"

বাবা বললেন, "তাই নাকি!"

তিনি চলে যাবার পর বাড়ীর ভিতরে এসে মাকে বললেন, "শুনছো, আমার নামে নিন্দে রটছে। আমি নাকি ছবি আঁকা ভুলে গেছি।"

মা বললেন, "তা, আঁকোই না বাপু, মনটাও ভাল থাকবে।"

বাবা তখনই মহাবীর বেহারাকে ডেকে বললেন, "ওরে কাল দক্ষিণের বারাণ্ডায় আমার রং, তুলি, জল ঠিক ক'রে গুছিয়ে দিবি। আবার ছবি আঁকবো।"

পরদিন থেকে পূর্ণ উৎসাহে আবার ছবি আঁকতে শুরু করলেন। শোকের ধাক্কায় সাময়িক বিহ্বলতা তাঁর দেখা গেছে অনেক সময় এই রকম। কিন্তু আবার ভিতরকার কর্মব্রতী-শিল্পীমন জেগে উঠেছে, আবার আপন কাজে নিবিষ্ট ভাবে লিপ্ত হয়েছেন। নিজের সাধনার পথে এগিয়ে চলেছেন দৃঢ় ভাবে।

দিদিমা মারা যাবার সময়েও বাবার কাতরতা দেখেছিলুম ছোটো ছেলের মত। বিশ্বাসও ছিল তাঁর শিশুর মত। দিদিমার যখন শ্বাস হ'চ্ছে বাবা আমায় বললেন, "বৌঠানকে ডাক্‌তো।"

বড়মাকে ডেকে আনলুম। তিনি তাঁকে বললেন, "মায়ের মুখে শুনে-ছিলুম, ছোটো বেলা তাঁর খুব অসুখ হয়েছিল। মৃতকল্প অবস্থা যখন, তুলসীতলায় নামিয়েছিল তাঁকে, সেই সময় দিদিমার (বাবার) হাতের বালা মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে জপ কর'তে ক'রতে তাঁর প্রাণ এসেছিল।

লোহার সিন্দুক খুলে দেখ না, যদি সেই বালাটা থাকে বিনয়িনী মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে জপ করুক।”

লোহার সিন্দুক খুঁজে বালা পাওয়া গেল না। তখন বাবার সে কি হতাশা !.

এই শোকের সময় তিনি দিদিমার একখানি ছবি এঁকেছিলেন, সেটি বরাবর বাবার ঘরেই থাকতো।

নিজের শোকেও যেমন সান্ত্বনা খুঁজতেন, তেমনি অপরের শোকেও সান্ত্বনা দিতেন নানা উপায়ে। আমার মেজ ছেলেটি, একবছর বয়সে মারা যায়। খুবই কাতর হ'য়ে প'ড়েছিলুম আমি। একদিন বাবা এসে একটি ছবি দিয়ে বললেন, “এই দেখ, তোর জন্যে একটা ছবি এঁকে এনেছি।” ছবিতে দেখি বুদ্ধদেবের পায়ের কাছে ছেলেটি বসে রয়েছে, মা তাকে খেলনা দিয়ে চলে গেছে, সে খেলা করছে। সান্ত্বনা পেলুম এই ভেবে—সত্যিই তো, ছেলেকে ভগবানের কাছে পাঠিয়েছি।

আমার স্বামী যখন মারা গেলেন, বাবা তখন বরানগরে গুপ্তনিবাসে থাকেন। বাবার কাছে গেলুম। বাবা বললেন, “এসেছ, বসো। এখানে থাকবে ?”

আমি বললুম—“হ্যাঁ।”

বাবার সেই স্নেহমাখা স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, “তা বেশ, থাকো দিন কতক। সংসার ছেড়ো না। এই দেখো, তোমার মা যখন মারা গেলেন, আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম। থাকতে পারলুম কি ? আবার ফিরে এলুম।” তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, “সবই মিথ্যে কিন্তু মৃত্যু সত্যি। মানুষ মরলে তার আবার জন্ম হবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু জন্মালে যে মরতে হবে এটা সত্যি।” এমনি কতো কথা বলতেন। এইভাবে আমায় শান্ত ক'রে আবার সংসারের কাজে ফিরিয়েছিলেন।
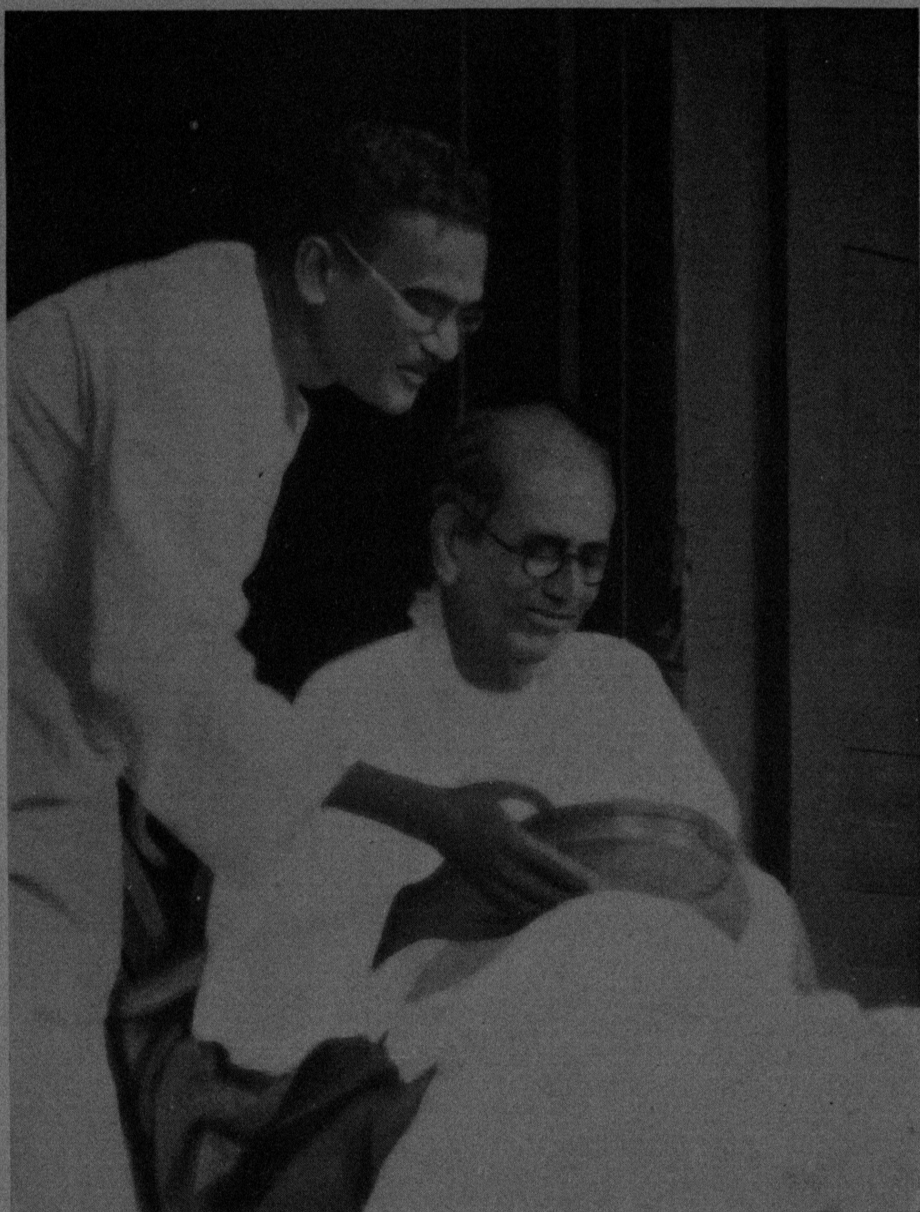
জন্মদিনে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল

তিনি নিজে শোক তাপ অনেক পেয়েছিলেন। আমার স্বামী মারা যাবার অনেক আগে মেজজামাই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মারা যান। তাঁর ছেলেমেয়েরা তখন খুবই ছোটো মোহন, শোভন আর টুনু। বাবা তাদের নিজের কাছে কাছে রাখতেন। তিনি হয়েছিলেন তাদের খেলার সঙ্গী—তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে খেলাধূলা করতেন আবার নিজের কাজও করতেন। ঠিক ছোটো ছেলের মত খেলনার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বরাবর। ছেলেদের জন্যে কোনো কলের খেলনা এলেই বাবা সেটি খুলে পরীক্ষা করতেন কেমন করে তৈরী হয়েছে। মা বা দিদিমার চোখে পড়লে তাঁরা বল্‌তেন, "গেল এবার খেল্‌নাটা!" কিন্তু তিনি ঠিক চালিয়ে যেতেন তাঁর ভাঙ্গা গড়ার কাজ।

এই রকম খেলনার কলকব্জা দেখতে দেখতেই বোধহয় বলেছিলেন—"দেখ, আমি বোধহয় ডাক্তার হলে খুব ভালো ডাক্তার হতে পারতুম।" তারপর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "ডক্টর অফ লিটারেচার" উপাধিতে ভূষিত করলেন তখন তিনি বলেছিলেন—"যাক ডাক্তার নামের সখ মিট্‌লো, কিন্তু কাজের ডাক্তার হতে পারলুম না।"

যা বলছিলুম, সেই দুরন্ত শোকেও তিনি করুণার ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে রাখতেন নিজেকে তাদের সমান করে নিয়ে। একটা শিশুমন তাঁর মধ্যে ছিল জীবনের শেষ যুগ পর্যন্ত। মনে পড়ে, আমাদের বাড়ী দক্ষিণ দিককার বারাণ্ডায় সরস্বতী পূজা হতো। বাবা বসতেন ঠাকুর সাজাতে ছোট ছেলেদের মত, রংবেরঙের কাগজে'র ফুল কেটে, গয়না তৈরী করে, ফুল পাতা দিয়ে।

ছোটোদের জন্যে লিখতেন, আঁকতেন, খেলনা তৈরী করতেন। এ ছিল তাঁর চিরদিনের আনন্দ। ছোটো ছেলে মেয়েরাও তাঁকে তাদের মতই ভাবতো, সেই ভাবে কথা কইতো। একবার আমার এক নাতনী

রানুকে নিয়ে বাবার 'গুপ্তনিবাস'-এ গেছ। বাড়ীর সামনে বাঁধের উপর দিয়ে রেল লাইন চ'লে গেছে। রেল যাচ্ছে দেখে রাণু ছুটে গিয়ে বাবাকে বললে, "কত্তাবাবা, আপনি কেন রেলটা ওখানে তুলেছেন? যখন গড়্গড়িয়ে এসে বাগানে পড়বে মজা টের পাবেন!"

বাবা তাকে জবাব দিলেন, "কি করি ভাই, নিচে দিয়ে নিয়ে গেলে এমন সুন্দর বাগানটা যে ভাঙতে হয়।"

ছোটোদের বিশ্বাসকে আঘাত দিয়ে ভাঙ্গতেন না কোনো দিন। তিনি চাইতেন ওদের সহজাত বিশ্বাস ওদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হোক।

জ্যাঠামশাইরা মারা যাবার পরও তিনি খুবই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। বড় জ্যাঠামশাই ছিলেন বাবার ছবি আঁকার কাজে উৎসাহদাতা আর মেজ জ্যাঠামশাই ছিলেন তাঁর লেখা ও পড়ার সঙ্গী। তা ছাড়া মেজ জ্যাঠামশাই বিষয় সম্পত্তি ও সাংসারিক কাজ সুচারু ভাবে চালাতেন; সেইজন্যে বাবা আর বড় জ্যাঠামশাই সাহিত্য ও চিত্রকলায় সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ডুবিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই জ্যাঠামশাইরা মারা গেলে বাবা একেবারে সারথী-কৃষ্ণবিহীন পার্থের মত অসহায় বোধ করেছিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমও ছিল তাঁর অগাধ।

রবিদাদা মারা গেলেও খুব ধাক্কা লেগেছিল। রবিদাদা ছিলেন বাবার গান-বাজনা, অভিনয় আর সাহিত্যের পথে পয়লা নম্বরের উৎসাহ দাতা।

নানান্ জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার সখ ছিল বাবার খুবই। এতে তাঁর হাওয়া বদলও হতো, ছবি আঁকার খোরাক সঞ্চয়ও হতো।

আর, কোথাও গেলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাই-ই—বিশেষ করে আমাকে। সে-কথা আগে বলেছি। তিনি কোথাও যাবার সঙ্কল্প একবার করলে তা কিছুতেই রদ হতো না। এমনি একবার মুসৌরী যাওয়া ঠিক হলো। বাবা তখন অফিসে কাজ করেন। আর্টস্কুলে। ছুটির দরখাস্ত করলেন। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হলো না। কারণ, তখনকার অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব ওই সময়েই বিলাত যাবেন—আগে থেকে ঠিক ক'রে ফেলেছেন। এদিকে বাবার যাত্রার তোড়জোড় সব ঠিক। জোড়াসাঁকোর বাড়ীশুদ্ধ প্রায় সকলেই যাবেন।

ছুটি পাবেন না শুনেই বাবা বললেন—"কুছ পরোয়া নেই। চাকরী ছেড়ে দেবো।"

পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়ে তিনি মুসৌরী রওনা হলেন।

আমাদের বললেন—"এ বেশ হলো! ছেলেবেলা 'পুডিং' আর 'পাডিং' নিয়ে মাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া করে ইস্কুল ছেড়েছিলুম, আর এ সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে আফিস ছাড়লুম।" এমনি ছিল তাঁর মজার মজার কথা। আর এমনি ছিল তাঁর বেড়াবার সখ। যেখানেই যেতেন সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মনের মধ্যে ধরে নিয়ে রং-তুলির সাহায্যে সজীব করে রাখতেন পটে। এই প্রাকৃতিক শোভা বৈচিত্র্য দেখার এবং দেখাবার উৎসাহ তাঁর ছিল অসাধারণ।

কোণারক দেখতে যাওয়ার কথা আগে বলেছি। একবার দার্জিলিংয়ে গেছি, বোধহয় আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাস, ফুলের বাহার পাহাড়ে পাহাড়ে—বাবা মনের আনন্দে এন্তার ছবি আঁকছেন। একদিন মাকে বললেন—"চলো তোমাদের হরপার্বতী দেখিয়ে আনি।" ঠিক হয়ে গেল সিঞ্চল যাবার। রাত্রি দুটোর সময় ঘোড়া আর ডাণ্ডিতে চড়ে সব বেরুনো হলো। ভোর বেলা গিয়ে সিঞ্চলে পৌঁছলুম। পাহাড়ের উপরে

একটা গোল ঘর, ভিতরে আগুন জ্বলছে। আমাদের পা-হাত ঠাণ্ডায় জমে যাবার দাখিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই ঘরের ছাদে ওঠা হলো। এদিক ওদিক দেখছি অন্যমনস্ক ভাবে, বাবা এমন সময় চেঁচিয়ে বললেন, "ঐ দিকে চেয়ে দেখ, আকাশের গায়ে সাদা তিনটে পাহাড়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। ঐ দিকে চেয়ে থাকো।"

চেয়ে রইলুম। ক্রমে রং বদলাতে লাগলো—পরের পর সাতটা রং বদলালো। তারপর তিনটে চূড়ায় যেন টপাটপ সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়ে দিলে কে! এর পর আস্তে আস্তে চূড়াগুলোর সবটা সোনা হয়ে উঠলো এবং পরক্ষণেই কোথা থেকে মেঘ এসে ঢেকে দিল। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে আমরা এই দৃশ্য দেখলুম, বলা যায় একেবারে দম বন্ধ করে। ফালটু বাবাকে বললে, "বাবু তোমাদের ভাগ্য ভালো তাই দেখতে পেলে। বেশীর ভাগ লোকই দেখতে এসে কেঁদে ফিরে যায়।"

আমি মনে মনে বললুম—কোন ভাগ্যবানের সঙ্গে এসেছি দেখতে হবে তো! রূপদর্শীকে রূপ না দেখালে স্রষ্টার কি তৃপ্তি হয়।

তাঁর বেড়াবার, দেখবার সখের কথা বললুম। আবার ঠিক এর বিপরীত, বিরাগও দেখেছি।

তখন দিদিমা মারা গেছেন, মার ইচ্ছা হলো তীর্থ করতে যাবেন। বাবা বললেন, "যেতে হয়, তুম মণিলাল কি অলককে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি যাব না।"

মা তাই করলেন। একবার মণিলালকে নিয়ে আর একবার অলককে সঙ্গে করে পশ্চিমের দিকে সব ঘুরে এলেন—মথুরা, বৃন্দাবন, সাবিত্রী পুষ্কর, আগ্রা, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি। সেই সব দেখে আসবার পর মা একদিন বাবাকে বললেন, "তুমি কি করে অমন ছবি এঁকেছো? আমি দেখে এলুম ওযে সব ঠিক তোমার আঁকা ছবির মত!"

বাবা তাঁর স্বভাবসুলভ মজা করে বললেন, "তুমি চর্মচক্ষে যা দেখে এলে, আমি মর্মচক্ষে তা দেখতে পেয়েছি। তুমি এত খরচ করে হাঙ্গামা পুইয়ে দেখে এলে, আর আমি এই বারাণ্ডায় বসে আগেই সব দেখে নিয়েছি। তবেই বোঝো, তোমার চেয়ে আমার পুণ্য কতো বেশী আছে।"

এ সময় বাবা আরব্য উপন্যাসের 'সেট' আঁকছিলেন। বোধহয় তখন এই ছবি আঁকার টানেই তীর্থ ভ্রমণের উৎসাহ নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিলো।

কতো কথাই যে মনে পড়ে! যেমন যেমন মনে আসছে ঠিক তেমনি বলে চলেছি। খণ্ড খণ্ড মেঘের মত, এক একটা ঘটনা। তাতে হয়তো একটানা কিছু নেই, তবে অনেক ছবি পাওয়া যাবে তাঁর দীর্ঘ জীবনের।

বাবা পুরানো জিনিষ ফেলে দেওয়া পছন্দ করতেন না। একটা পুরানো জিনিষকে নিয়ে মাথা খাটিয়ে আর একটা নূতন জিনিষ করে গড়বার নেশা ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। পুরানো কাপড় জোগাড় করে কাঁথা সেলাই করিয়ে কিনে নিতেন। এটা ওটা দিয়ে খেলনা তৈরী করে দিতেন।

আমার স্বামীর বুক বাইণ্ডিং কারখানা যখন খুললেন, বাবা প্রায়ই দেখতে আসতেন। পেস্ট বোর্ডের চৌকো ছাঁটগুলো কারখানায় পড়ে থাকতে দেখে বাবা তাঁকে বললেন, "এগুলো ফেলোনা। আগে যেমন অ-আ লেখা তাস হতো, আমি ছড়া লিখে দেবো—তোমরা ছড়া অনুযায়ী উল্টো পিঠে ছবি আঁকিয়ে তাস কর, খুব চাহিদা হবে।" তাঁর কথামতো ছাঁটগুলো জমা ক'রে রেখে-রেখে শেষে সেগুলি তাঁকে পাঠিয়ে

দেওয়া হলো। তিনি তাতে প্রত্যেক স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জন বর্ণের একটি একটি ছড়া লিখে দিলেন।

নিজের বই খাতা অনেক সময় তিনি নিজেই বাঁধিয়ে নিতেন। কখনো কোনো কাজ 'আমার দ্বারা হলো না' বলে ফেলে রাখতেন না।

ছোট ছেলেরা নূতন খাতা পেলে যেমন খুসী হয় বাবাও তেমনি খুসী হতেন নূতন খাতা পেলে। আমার স্বামী প্রায়ই নূতন খাতা, ছবি-আঁকবার কাগজ বাবাকে দিয়ে আসতেন। তিনি এসে বলতেন, "খাতা আর কাগজ পেলে বাবা ঠিক ছোট ছেলেদের মত খুসী হয়ে ওঠেন। তাঁর ঐ আনন্দ দেখলে আমিও আনন্দ পাই।"

নূতন জিনিষ পাওয়ার আনন্দের কথা বললুম। কিন্তু আবার পুরানো জিনিষের বদলে নূতন জিনিষ বাবাকে ব্যবহার করানো খুব মুস্কিল হতো। একটি কাঁসার ঘটিতে বাবা জল খেতেন। সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে মা একটি রূপোর ঘটি করিয়ে বাবাকে দিলেন। কিন্তু বাবা কিছুতেই সে ঘটিতে জল খাবেন না। আমি তাই শুনে তাঁকে বললুম, "মা দুঃখ পাবেন। তুমি কিছুদিন জল খাও, তারপর আবার তুলে রেখে দিও।" তখন থেকে সেই ঘটিতে জল খেতে লাগলেন।

মা মারা যাবার পর বাবা বললেন, "ও ঘটি তোলো। চোর ডাকাতে লুটে নেবে। আমি সব সময় ও ঘটি আগলাতে পারবো না।" তারপর আর সে ঘটিতে কখনো জল খান নি।

বাবা তাঁর সাংসারিক জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু ছবি আঁকার জীবনেও তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

বাবা ছবি আঁকছেন, আমি পিছনে দাঁড়িয়ে। ছবিখানি জলে ডুবিয়ে চেপ্টা তুলি দিয়ে মুছে রোদে দিলেন। রোদ থেকে যখন সেটি তুলে আনলেন, তখন তাঁর মুখ বিষন্ন। বললেন, "যে রং মনে এসেছিল, হাতে তা বের করতে পারলুম না।" দুঃখ যে কত খানি পেয়েছেন তাঁর কথাতেই বুঝতে পারলুম।

তিনি নিজেই বলতেন, "শিল্পীর জীবনটা দুঃখের। কবির জীবন অনেক ভাল। লেখার মধ্যে দিয়ে মনের ভাব ফোটানো অনেক সহজ। কিন্তু তুলির সাহায্যে মনের মতো ছবি আঁকা বড়ো শক্ত।"

বাবার খেলনা তৈরীর সখের কথা বোধহয় বলেছি। তাঁর খেলারও সখ ছিল ছোটদেরই মত। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর গোল-বাগানে একটি ফোয়ারা ছিল, তার মাঝখানে দ্বীপের মত একটি 'চাইনীজ' ছোট্ট বাড়ী ছিল। এটি কবে যে সেখানে বসানো হ'য়েছিল জানি না। জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখে আসছি। মনে পড়ে, বাবা চীনে-জাপানী পুতুল এনে জলের মাঝে সেই রাজপুরীটি সাজাতেন। দাবার সখ হলো একবার, কাশী থেকে ফরমাস দিয়ে ঘুঁটি করিয়ে আনলেন। নিজে নক্সা ক'রে পাঠালেন রাজা, মন্ত্রী, ঘোড়া, নৌকো, সবগুলোর। কাশী থেকে জর্মন সিলভারের পুতুল হয়ে এলো সেগুলো। তা দেখে আনন্দ আর ধরে না।

ছাত্রদের প্রসঙ্গে বাবার স্নেহপ্রবণ মনের কথা বলেছি এর আগে। এই কোমল মনটি ছিল তাঁর সহজাত। সকলের বেদনাকে নিজের বেদনার মত বোধ করতেন তিনি। বড় জ্যাঠামশাইয়ের বড় ছেলে বিয়ের এক বছর পরে মারা যান, আঠারো বছর বয়সে; বারো বছরের স্ত্রীকে

রেখে। সকলে শোকে মুহ্যমান। বাবা অত্যন্ত কাতর হলেও সকলকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কাশী থেকে কথক ঠাকুর আনিয়ে ভাগবত-পাঠের ব্যবস্থা করলেন। শিলদা থেকে কীর্তনীয়া আনিয়ে কীর্তন করবার ব্যবস্থা করলেন। ধর্মকথা আর কীর্তনের মধ্যে সকলকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। দাদার স্ত্রীকে ধর্ম পুস্তক দিতেন পড়তে, কাছে ডেকে বিস্তর গল্প বলতেন। নিজে খুবই বিমর্ষ হলেও তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন সব সময়।

এর কিছুদিন পরে আমার ঠাকুরমা মারা যান। তারপরই বাবার খুব অসুখ হয়। কেউ বললেন পেটের ভিতর ফোড়া হয়েছে, কেউ বললেন পাথর হয়েছে। বাবা খুবই যন্ত্রণা পাচ্ছেন ক'দিন ধরে। একদিন রাত্রে একটু ঘুমিয়েছেন এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন ঠাকুরমা (বাবার মা) এসে যেন বলছেন, "অবন তোর কিছু হয় নি, আমি পেটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, সেরে যাবে।"

পরের দিন ভোরে উঠে মুখ ধুয়ে বাবা বললেন, "আমার পেটের ব্যথা সেরে গেছে।" তারপর দক্ষিণের বারাণ্ডায় নিজের বসবার জায়গায় গিয়ে চাকরকে বললেন, "রুটি চা নিয়ে আয়, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

জ্যাঠামশাই নেমে এসে বাবাকে দেখে বল্‌লেন, "একি অবন, তুমি রুটি-চা খাচ্ছ যে! ডাক্তার বারণ করেছেন!"

বাবা বললেন, "আমার সব সেরে গেছে, মা আমার পেটে হাত বুলিয়ে সারিয়ে দিয়েছেন।" কী দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাবার!

অনেক বড় বড় লোক আসতেন বাবার কাছে। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে একবার ভগ্নী নিবেদিতা এসেছিলেন বাবার কাছে। বাবা বলতেন, "অনেক

ভক্তিমতী মেয়ে দেখেছি, এমন সুন্দর কথা, এমন ভক্তিমাখা চেহারা কখনো দেখিনি।" লোক চেনবার ক্ষমতা ছিল বাবার অদ্ভুত। তিনি চেহারা দেখেই বুঝে নিতেন তার স্বভাব কেমন। যাঁরাই তাঁর সঙ্গে মিশেছেন তাঁরাই তাঁকে ভালোবাসতেন। সকল বিষয়ে তাঁকে কাছে পাবার চেষ্টা করত সকলে।

একবার আমরা সকলে বাবার সঙ্গে দেওঘরে গেছি। একদিন ওখানকার বিদ্যাপীঠ থেকে দু' তিন জন ভদ্রলোক এসে বাবাকে ধরলেন তাঁদের বাৎসরিক উৎসবে তাঁকে কিছু বলতে হবে। শুনে তো বাবা ভেবেই অস্থির। বললেন, "এই দেখো! এখানে চেঞ্জে এসেছি, এখানেও লেকচার দিতে হবে!"

পিসেমশাই বললেন, "তা, গিয়ে বলোই না কিছু। তাতে তোমার এমন কিছু অসুবিধে হবে না।"

শেষ পর্যন্ত বাবাকে যেতে হলো। তাঁরা বাবাকে সভাপতির আসনে বসিয়ে দিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দিলে। বাবাও নাকি এত সুন্দর বলেছিলেন যে সকলে মুগ্ধ হ'য়ে গিছ্‌লো চিত্রশিল্পীর ভাষণে। বক্তৃতার কথা বললেই কিন্তু তিনি ভেবেই অস্থির হতেন সব সময়। কিছু বলতে সহজে রাজী হতেন না, কিন্তু যদি একবার বলাতে পারা যেতো তাহ'লে কথায় কথায় শ্রোতাদের টেনে নিয়ে যেতেন এক নূতন ভাবরাজ্যে, ঠিক যেমন সকলের মনকে আকর্ষণ করতেন তাঁর ছবির সাহায্যে। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে ছিল তাঁর বলার ভঙ্গী। পড়াশোনাও ছিল অগাধ। তাই সহজ কথায় গভীর ভাবের বিষয়ও আলোচনা করতেন।

তাঁর পড়াশোনার কথা যখন উল্লেখ করলুম তখন বলি—তাঁর স্মরণ শক্তির কথা। বিরাট লাইব্রেরী ছিল ওঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। বহু ভাষার বহু গ্রন্থ ছিল তাতে। পুরাতন ছবিরও সংগ্রহ ছিল। তা

ছাড়া বাবার নিজের ছিল সংগৃহীত বহু প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ, সংস্কৃত পুঁথি, ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতি। সব তাঁর পড়া। কোন বিষয়টি কোন গ্রন্থে আছে তা তাঁর বরাবর মনে ছিল। বাবার মৃত্যুর দিন-পনের আগে 'গুপ্ত নিবাসে' গিয়েছিলুম। কথায় কথায় বলেছিলুম, "বাবা, আমাদের দেশের আগেকার রাজা-রাজড়াদের কথা পড়তে বড়ো ভালো লাগে।"

তিনি তখুনি বললেন, "আমার আলমারীতে 'রাজতরঙ্গিনী' আছে তুই নিয়ে পড়িস।" কোথায় কোন বই আছে তাও মনে থাকতো সব সময়। ছবি বা পুরাণো পুতুল বা মূর্তির সংগ্রহ যেখানে যেমন ভাবে রাখতেন, ঠিক তেমনটি থাকা চাই। কাউকে তা সরাতে দিতেন না।

ছোটোবেলা দেখেছি, দিদিমা যদি বলতেন, "পুতুলগুলো সাফ ক'রে দিই?"

বাবা বাধা দিয়ে বলতেন, "না না, ওই রকমই থাক, সাফ্ করবেন না।" আমরা এখনও বুঝি না তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থ কি ছিল।

রবিদাদার তখন অসুখ। বাবা প্রায়ই ওঁর কাছে যেতেন। একদিন রবিদাদা সকলকে ডেকে বললেন, "আমার জন্মদিনটা যখন এত ঘটা করে হয়, অবনের কেন হবে না? তোমরা এবার ওর জন্মদিনটা ঘটা করে করবে। ও কি আমার চেয়ে কম? আমাদের লক্ষ্যস্থল একই, রাস্তা দুটো আলাদা।"

জন্মদিনের কথা শুনে বাবা চেঁচামেচি করতে শুরু করলেন—"না না, এ কিছুতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার তুলনা?"

রবিদাদা বাবাকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি থামো। আমি যা বলছি তাই হবে।"

শেষ পর্যন্ত বাবাকে রাজী হতে হলো।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই বছর জন্মাষ্টমীর আগেই শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবিদাদা চলে গেলেন। তাঁর কথামত জন্মাষ্টমীর দিনে রবিদাদার লাল বাড়ীতে বাবার জন্মদিন পালন করেছিল ছাত্রছাত্রীরা।

সেই থেকে বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন জন্মাষ্টমীর দিন তাঁর জন্মদিন পালন করা হতো। বহু লোক আসতেন। গান, বাজনা আলোচনা ইত্যাদি হতো। কিন্তু বাবা তার আগে থাকতেই অস্থির হয়ে পড়তেন। বলতেন, "এমন দিনে জন্মেছি যে, ও দিনটি কেউ ভুলবে না।" জন্মাষ্টমী সব বাঙ্গালীর মনে থাকে। রবিদাদা নিজেকে ছড়াতে ভালোবাসতেন রবির মতই, কিন্তু বাবা নিজেকে ধরে রাখতে ভালোবাসতেন।

গরীব দুঃখীদের প্রতি বাবার দয়া ছিল ফল্গুধারার মত। একবার হ'লো কি, বাবার খাস খানসামা রাহুর বউ মারা গেল। রাহু বাবার কাছে খুব কান্নাকাটি করলো। বাবা তাকে প্রথমে সান্ত্বনা দিলেন—"সবই ভগবানের হাত।"

তারপর বল্‌লেন, "তাতে আর কি হয়েছে, তুই আবার বিয়ে কর। জানিস তো, ভাগ্যবানের বউ মরে আর অভাগার ঘোড়া মরে।"

মা তাঁর কথা শুনে বললেন, "ও আর বিয়ে করবে না। বিয়ে করতে গেলে ক'নের বাপকে ওদের পণ দিতে হয়। কোথায় পাবে ও অত টাকা!"

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কত টাকা লাগবে, রাহু?"

রাহু বললে, "কনের বাপকে একশ' টাকা পণ দিতে হবে, বউকে

একখানা সোনার গয়না দিতে হবে, সেও শ'খানেক টাকার কম নয়। তারপর বিয়ের খরচ।"

মা বল্‌লেন, "দেখ দেখি, এত টাকা ও পাবে কোথায়?"

বাবা বল্‌লেন, "তাই ব'লে ওর সংসার হবে না? ও কি সন্ন্যাসী হবে? না না, বিয়ে আমি ওর দেবোই।"

মা বল্‌লেন, "যা রাতু, আজ তোর কপালে কিছু লাভ আছে।"

তখন মিউজিয়ামে চিত্র প্রদর্শনী চলেছে। বাবা বিকালবেলা সেখানে গেলেন। বাড়ীতে যখন ফিরলেন তখন খুব খুসী-খুসী ভাব। ঘরে ঢুকতে প্রথমেই ডাক পড়লো রাতুর। রাতু আস্‌তেই বাবা বল্‌লেন, "তোর কপালে আমার একটা ছবি তিনশ' টাকায় বিক্রী হয়েছে। এটা তুই সবটাই নে। একশ' টাকা পণ, বউয়ের হাতে বাজুবন্ধ একশ' টাকা আর বিয়ের খরচ একশ' টাকা। কালই তোর দাদাকে চিঠি লেখ। বউ ঠিক করে খবর দিলেই বিয়ে করে আয়।"

তাঁর কথা শুনে মা হেসে বল্‌লেন, "কি জিদ্! সেই টাকা জোগাড় করে রাতুকে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।"

বাবা বললেন, "দেখ্‌লে তো, সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা এসেও গেল। ওর জন্যেই ভগবান দিয়েছেন, ওকেই দিলুম।"

তার কয়েকদিন পরে রাতু তার দাদার চিঠি পেয়ে বিয়ে করতে চলে গেল।

বাবার খুবই অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু মুখে বলছেন যে, তিনি অন্য চাকরদের দিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন।

অনেকদিন হয়ে গেল। মা বকাবকি করছেন—"রাতুকে চিঠি লেখো, তাড়াতাড়ি চলে আসুক।"

বাবা তাই শুনে বল্‌লেন, "আহা, রোসো, দ্বিতীয় পক্ষের বউ

তাড়াতাড়ি ফেলে আস্‌তে পারে ? একটু ঘর-বসত না করে আস্‌বেই বা কি করে ?”

কিন্তু মা কিছুতেই শুন্‌বেন না। অনেক দিন হয়ে গেছে, রাছুকে শীগগির আস্‌তে লেখা হোক—বাবার খুবই কষ্ট হচ্ছে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়েও যখন মাকে শান্ত করতে পারলেন না তখন অগত্যা একটা চিঠিই লিখে দিলেন—

কল্যাণবরেষু

বাবা রাছু, তোমার মাতাঠাকুরাণীর আদেশ মত এই পত্র লিখলাম। তোমার বিবাহ কার্য সমাধা হইয়া থাকে তো এই পত্রপাঠ মাত্র চলিয়া আসিবে। তোমার পিতাঠাকুরের কার্যে অসুবিধা হইতেছে। তুমি নব বধূমাতাকে আমাদের আশীর্বাদ দিবে। এই পত্র টেলিগ্রাফ বলিয়া জানিবে। ইতি—

তোমার পিতাঠাকুর
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই তো গেল নিজের চাকরের প্রতি স্নেহশীলতার উদাহরণ। একথা বাড়ীর সকলেই জান্‌তেন। বাইরেও তাঁর এরকম বদান্যতার অভাব ছিল না। এই রকম করে বাবা যে কত লোককে কত রকমে সাহায্য করতেন, দান করতেন সে সব খবর অবশ্য কেউ জানতে পারতো না। কদাচিৎ কখনও হয়তো শোনা যেতো কোনো কোনো বদান্যতার কথা খোদ গ্রহীতার মুখে। দানের ব্যাপারে তাঁর সব সময় চেষ্টা ছিল কেউ যেন না জান্‌তে পারে। তবে মার কাছে প্রায়ই ধরা পড়ে যেতেন—যখন কোনো টাকা-কড়ির হিসেব দিতে গিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌তেন, “ওটা খরচ হয়ে গেছে।”

শেষ জীবনে তিনি ছবি আঁকাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। জোড়া-সাঁকোর বাড়ী ছেড়ে 'গুপ্ত নিবাসে' আসবার কিছু আগে থেকেই গাছের ডাল, এটা ওটা সেটা নানা অকাজের জিনিষ দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেল্‌না গড়তেন। মনটা উদাস হয়ে গিছলো জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায়। সেই উদাসী মনই তাঁর ঐ কাটুম-কুটুমে প্রকাশ পেয়েছিল।

একবার জিজ্ঞাসা করেছিলুম তাঁকে, "বাবা, তুমি আর ছবি আঁকো না কেন?"

উদাসভাবে বলেছিলেন, "মনে আর রং ধরে না তো আঁকবো কি! এখন আমার এই কাটুম-কুটুমই ভালো।" শেষ বয়সে কাঠকাঠ্‌রাকে রূপ দিতেন।

এর অনেক আগে দেখেছি মাঝে মাঝে পাথর কেটে রূপ দান করতেন। অনেক দিন আগেকার কথা বলছি। একবার আমার একটা পাথরের চাকি ভেঙ্গে গিছ্‌লো, আমি সেটাকে জলে ফেলে দিতে বল্‌ছি দাসীকে, বাবা তা শুনতে পেয়ে বল্‌লেন—"না, না, ফেলো না, আমায় দাও দেখি।"

বাবা সেই দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডায় পাথরটি নিয়ে বস্‌লেন খোদাই করতে। আমার বুড়ী দাসী আমার তিন মাসের ছেলে ক্ষেপুকে কোলে

ক'রে পা ছড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে আর ঢুল্‌ছে। বাবা সেই ছবি চাকিতে কুঁদে তুলে নিয়ে আমায় দিলেন সেটি এখনও সযত্নে রাখা আছে। এমনি ছিল তাঁর খেয়াল-খুসীর কাজ।

খেয়ালও ছিল তাঁর অনেক রকমের। ফার্সী হরফের অনুকরণে বাংলা লেখা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও মেতে পড়তেন মাঝে মাঝে। দেখতুম অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পোকা-মাকড় পরীক্ষা করছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

নাম, যশ বা টাকাকড়ি হবে বলে কোনোদিন কিছু করতেন না। যখন যেটা সখ হয়েছে করেছেন। কারুর নিন্দা-ঠাট্টায় কখনো পিছিয়ে যান নি। নাচ, গান, কীর্তন, কথকতা, যখন যেটার সখ হতো বা ঐ সকল সম্পর্কে নামকরা কেউ কলকাতায় আস্‌তো তখনই বাড়ীতে তার একটা অনুষ্ঠান পর্বের আয়োজন হতো। বাড়ী জম্‌জম্‌ করে উঠ্‌তো। তখনকার দিনে যাঁরা সব নামকরা গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে কেউই বোধহয় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতে বাকি ছিলেন না।

নানা রকম খেয়াল আর শিশুসুলভ সরল মন নিয়েই বাবা কাটিয়ে গেছেন বরাবর। কখনো কখনো অবাক হয়ে যেতুম তাঁর আচরণ দেখে, আর ভাবতুম—মহৎ যাঁরা তাঁদের মনটাও বুঝি নির্মেঘ আকাশের মত প্রশস্ত।

তখন আমরা মদনমিত্র লেনের বাড়ীতে থাকি। একদিন সকালবেলা চাকর গিয়ে আমায় অন্দরে খবর দিলে—কত্তাবাবু এসেছেন, বাবুকে ডাক্‌ছেন।

আমি বাইরে এসে বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি তাঁর দুই পায়ে দু'রকম জুতো। আমি বল্‌লুম—"এ কি করেছো বাবা? তোমার দু' পায়ে যে দু'রকম জুতো!"

বাবা বললেন, "ওই দেখ! একটি লোককে একটা চাকরীর জন্যে চিঠি লিখে দিয়ে চিঠিটা দেওয়া ঠিক হলো কিনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ওর (আমার স্বামীর) সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে ছুটে এসেছি। মাথার ঠিক নেই।" বলে হেসেই অস্থির।

আমার স্বামী বল্‌লেন, "চিঠিটা যখন দিয়েই দিয়েছেন তখন আর ভেবে কি হবে?"

যখনই কোনো সমস্যার উদয় হতো মনে তখনই ছোটো ছেলের মত ছুটে আসতেন জামাইয়ের কাছে, মেয়ের কাছে, বলবার জন্যে—এমনই ছিল তাঁর সরলতা।

বাবার দীর্ঘ জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী লেখবার মত শক্তি আমার নেই। খাপছাড়া ভাবে বলে চলেছি ঘটনাগুলো যেমন মনে উদয় হচ্ছে।

রবিদাদার মৃত্যুর কিছু আগে থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকার সময় পর্যন্ত বাবা রাণীকে (রাণী চন্দ) মুখে মুখে তাঁর জীবন-কথা বলতেন। রবিদাদার মৃত্যুর পর বাবা কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন আচার্য হিসাবে—রবিদাদার স্থলাভিষিক্ত হয়ে। এর আগেই মা মারা গেছেন। রাণী বাবার কাছ থেকে তাঁর জীবনকাহিনী শুনে লিখে ছাপিয়েছেন—মস্ত বড় কাজ করেছেন রাণী। তাঁর জীবনকাহিনী তাঁর নিজের মুখের কথা শুনে ছাড়া অমন সুন্দর করে কেউ লিখতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বাবা শান্তিনিকেতনে থাকা কালে আমিও গিয়েছিলুম কিছুদিন। দেখতুম বাবা বেশ আনন্দেই আছেন। কিন্তু এক এক সময় আমায় বলতেন, "আমার আর এখানে ভালো লাগ্‌ছে না। আমায় বাড়ী নিয়ে চল।" আমি চলে যাবো।
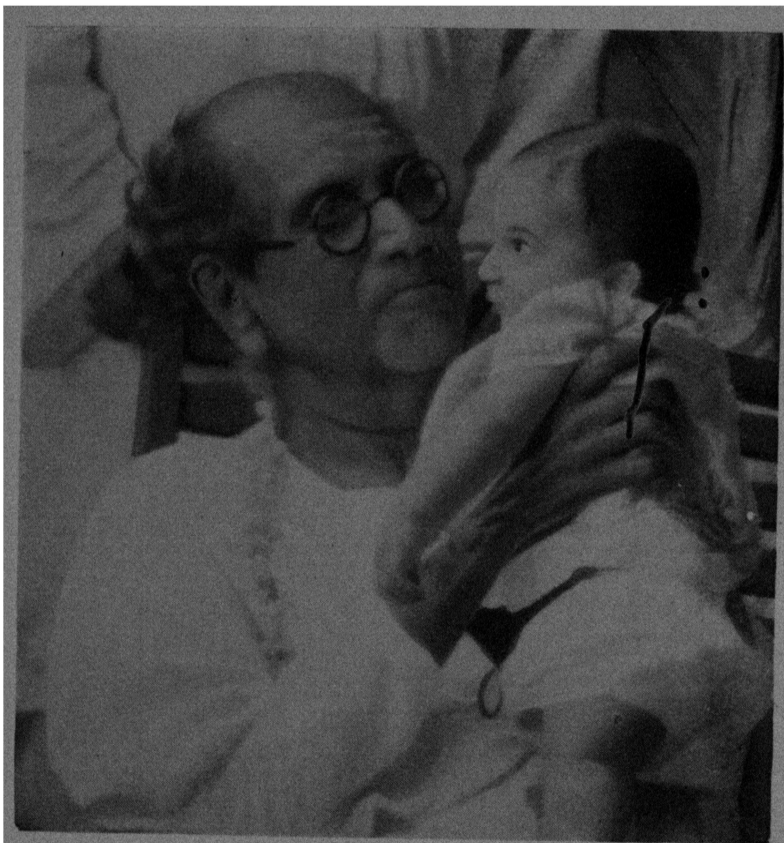
নাতনী কোলে অবনীন্দ্রনাথ

যেদিন চলে আসি সেখান থেকে সেদিন আমার চোখে জল এল তাঁর অবস্থা দেখে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মালপত্তর গুছিয়ে বাসে তুলে দিলেন। সঙ্গে এলো তাঁর চাকর, আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে গিয়ে তাঁকে খবর দেবে বলে! সেদিন আবার উত্তরায়ণে একটা সাপ বেরিয়েছিল। যতক্ষণ না বাসে উঠেছি ততক্ষণ আমাকে তাঁর কাছে বসিয়ে রাখলেন ছোট্ট মেয়েটির মত আগলে।

বড়ো ঘরোয়া ছিল তাঁর স্নেহপ্রবণ মনটি। সব সময় সকলকে কাছে কাছে নিয়ে থাকবেন এই ছিল সব সময়ের ইচ্ছে। যখন শরীর খারাপ হলো, শান্তিনিকেতন থেকে বাবা বরানগরে 'গুপ্তনিবাসে' ফিরে এলেন। আমি তখন মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর কাছে থাকতুম।

একদিন কথা কইতে কইতে আমায় বললেন,—"আমার মা তোদের দুই বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন খুব কাছাকাছি দেখে, তোরা আমার কাছে কাছে থাকবি বলে।" তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,—"কোথায় রইল সে (করুণা), কোথায় রইলি তুই, আর কোথায় রইলুম আমি।"

আর একদিন বললেন, "জানিস্, কোথা থেকে না আমন্ত্রণ পেয়েছি। দিল্লী, লাহোর, জয়পুর, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, চীন, সব জায়গা থেকে আমায় ডেকেছে। কেন যাই নি জানিস্? তোর মাকে একলা রেখে যেতে হবে বলে। বড়ো ভীতু ছিল সে।"

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি তখন কাশীতে আছি। খবর পেলুম বাবা আর রবিদাদা লক্ষ্ণৌ থেকে ক'লকাতা ফিরে যাচ্ছেন। বেলা চারটের সময় ট্রেন আসবে বেনারসে, অনেকক্ষণ থামবে।

আমার স্বামী বললেন কিছু খাবার তৈরী করে নিতে, তার সঙ্গে কিছু ফল কিনে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হবে।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হলুম। বহু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে ওঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। গাড়ী এসে ষ্টেশনে ঢুকলো যথা সময়ে। প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় রবিদাদা, বাবা আর এণ্ডরুজ সাহেব বসে আছেন। আমরা গাড়ীতে উঠে প্রণাম করে বললুম, "খাবার এনেছি।"

রবিদাদা বললেন, "নেলি, তোর বাবাকে একটু খাওয়া। কাল থেকে ও ভাল করে খায় নি। কাল টেলিগ্রাম পেয়েছে তোর মায়ের শরীর খুব খারাপ। বাস্ আর এক দিনও রইলো না। তোর বাবাব যদি কিছু হবে! বিলেত নিয়ে যেতে চাইলুম তাও গেল না।"

এণ্ডরুজ সাহেব হেসে আমায় বললেন, "কে কাকে বলেন তার ঠিক নেই। গুরুদেব কাল টেলিগ্রাম পেয়েছেন বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব) মারা গেছেন। উনিও ট্রেনে উঠে সেই যে চুপ করে বসে আছেন, এই আপনারা আসতে কথা কইলেন। উনিও কাল থেকে কিছু খান নি।"

কমলালেবু ছাড়িয়ে কচুরী সন্দেশ পিরিচে করে গুছিয়ে দু'জনকেই খাওয়ালুম। দুইজনেই খুব কাতর হয়েছিলেন এই দুটি খবর পেয়ে।

বাইবে যতই নাম যশ হোক না কেন, অন্তর ছিল একান্ত আত্মীয়-বৎসল। আত্মীয়-স্বজনের, দূরই হোক, নিকটই হোক, কারও কিছু খারাপ খবর পেলে চঞ্চল হয়ে পড়তেন খুবই। সেই জন্যেই ঘর ছেড়ে বাবা কিছুতেই দূরে যেতে চাইতেন না। কোথাও গেলে সকলকে সঙ্গে নেবাব চেষ্টা করতেন বরাবর।

মৃত্যুর বছর দুই আগে থেকে বাবা প্রায় সকল কাজই ছেড়ে

দিয়েছিলেন। কোনো কিছুতেই আসক্তি ছিলো না আর। দেখলে মনে হতো যেন সব কাজ শেষ করে, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বসে আছেন প্রস্তুত হয়ে, কোন্ অজানা-লোকের আহ্বানের প্রতীক্ষায়। বসে বসে কেবল মাঝে মাঝে 'মা মা' বলে ডাকতেন। জানি না কোন্ মা-কে ডাকতেন—জগজ্জননীকে, না নিজের মাকে! বোধহয় দুই মা-ই এক হয়ে গিয়েছিল তখন ওঁর কাছে।

মারা যাবার আটদিন আগে আমি গিয়ে বাবার কাছে দু'তিন দিন ছিলুম। যেদিন বাড়ী ফিরবো বাবার কাছে বলতে গেলুম। যাবার কথা শুনে বললেন, "আজ আর যেও না, দু'দিন থাকো।"

সেদিন আমি আর এলুম না। পরদিন আমাকে নিজে থেকেই বললেন, "আচ্ছা, যাবে যাও ছেলেরা আবাব ভাববে। তবে আমার বাড়াবাড়ি খবর পেলেই যেন চলে এসো।"

তখনও ভাবতেও পারি নি তিনি আর বেশীদিন থাকবেন না। চলে গেলেন। মনে হলো, যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সকল কাজ চুকিয়ে।

॥ সমাপ্ত ॥